POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

فَقُلۡ تَعَالَوۡا نَدۡعُ اَبۡنَآءَنَا وَاَبۡنَآءَکُمۡ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَکُمۡ وَاَنۡفُسَنَا وَاَنۡفُسَکُمۡ ۟ ثُمَّ نَبۡتَہِلۡ فَنَجۡعَلۡ لَّعۡنَتَ اللّٰہِ عَلَی الۡکٰذِبِیۡنَ○ (آل عمران:62)

"তাহাকে তুমি বল, আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত যাচনা করি।"(আলে ইমরান,আয়াত: ৬২)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড 4

সংখ্যা 16

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 18 এপ্রিল, 2019   12 শাবান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তাকওয়া বা পুণ্য কোন সাধারণ বিষয় নয়। কারণ এই পুণ্যের মাধ্যমেই সেই সকল শয়তানী কুমন্ত্রনার মোকাবেলা করতে হয়, যা মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর প্রভুত্ব করে বসেছে। 'নফসে আম্মারা' (অবাধ্য প্রবৃত্তি) রূপে এই সমস্ত শক্তিগুলিই শয়তান যা মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। যদি এগুলির সংশোধন না হয়, তবে তা মানুষকে নিজ দাসে পরিণত করে। এমনকি জ্ঞান-বুদ্ধিই অপপ্রয়োগের মাধ্যমেই শয়তানে পরিণত হয়। মুত্তাকির কাজ হল এটিকে এবং অন্যান্য সকল শক্তিবৃত্তিকে পুণ্যার্থে, এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

আল্লাহ্‌র রিযক থেকে ব্যয় করা

মুত্তাকির প্রশংসায় বলা হয়েছে- وَمِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ (বাকারা: 8) এখানে মুত্তাকির জন্য 'মিম্মা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, সে এখনও দৃষ্টিহীন অবস্থায় থাকে। এই কারণে যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা তাকে দিয়েছেন তার থেকে কিছুটা অংশ আল্লাহ্‌র পথে সে ব্যয় করে। বস্তুতঃ যদি সে দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন হত, তবে দেখত, তার কিছুই নেই, সব কিছুই আল্লাহ্‌র। এই অজ্ঞানতা এক প্রকার পর্দা যা 'ইত্তিকা বা পুণ্যের জন্য অপরিহার্য বিষয়। এই অবস্থা মানুষকে খোদা প্রদত্ত রিযক বা দান থেকে কিছু অংশ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে। হযরত রসুল করীম (সা.) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঘরে কি কিছু (খাদ্যদ্রব্য) রয়েছে? জানা গেল যে এক দিনার রয়েছে। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন-

' কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে দেয়, সে তাঁর নৈকট্যভাজন হতে পারে না। মহানবী (সা.) পুণ্য বা ইত্তিকার মর্যাদা অতিক্রম করে 'সালাহিয়াত' বা উচ্চতর পুণ্যের মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর জন্য কখনওই 'মিম্মা' শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। কেননা, সেই ব্যক্তি অন্ধ, যে নিজের জন্য কিছু রেখে দেয়, আর কিছুটা খোদার জন্য দান করে। তথাপি এটিই মুত্তাকি ব্যক্তির অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। কেননা, খোদার পথে দান করার ক্ষেত্রেও সে নিজের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে। এই কারণেই সে কিছুটা রেখে দেয় আর কিছুটা দান করে। কিন্তু মহানবী (সা.) সব কিছুই আল্লাহ তা'লার পথে দান করেছেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন নি।

যেরূপে ধর্ম মহোৎসবের প্রবন্ধে মানুষের তিনটি অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেগুলির মধ্য দিয়ে তাকে অতিক্রান্ত হতে হয়। অনুরূপভাবে মানুষকে ক্রমবিকাশের পর্যায় গুলি অতিক্রান্ত করানোর উদ্দেশ্যে যে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে, তা 'ইত্তিকা' বা পুণ্যের মাধ্যমে শুরু করেছে। আর এর জন্য সাধনা বা সংগ্রামের প্রয়োজন। এটি এক দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র। সে এমন এক শত্রুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে যার উভয় হাতে তরবারি রয়েছে। যদি সে এখান থেকে রক্ষা পায় তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যথায় সে وَاِلَّا اَسۡفَلَ السّٰفِلِیۡنَ-এ (নিকৃষ্টতার অতলান্তিক গহ্বরে) নিপতিত হবে। এই কারণে এখানে মুত্তাকিদের প্রশংসায় একথা বলা হয় নি যে, যা কিছু আমরা দান করি সে তার সমস্তটাই ব্যয় করে। মুত্তাকিদের মধ্যে ঈমানী শক্তি এতটা প্রবল থাকে না, যা নবীর মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। যার প্রভাবে সে খোদা প্রদত্ত সমগ্রটাই খোদাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী (সা.) করতেন।

এই কারণে প্রথমে সামান্যহারে ট্যাক্স চাপানো হয় যাতে এই ত্যাগ স্বীকারের আস্বাদ তাকে আরও উচ্চতর ত্যাগ-স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করে।

রিযক (দান)

وَمِمَّا رَزَقۡنٰہُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ (বাকারা: আয়াত-৪) রিযক বলতে কেবল ধন-সম্পদকেই বোঝানো হয় নি। বরং এর অর্থ হল মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, যেমন- জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান- এসব কিছুই 'রিযক'-এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলির মধ্য থেকেই মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে হবে।

ক্রমবিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার পূর্ণতা লাভ

এই পথে মানুষকে ক্রমাগত ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। মুসলমানদেরকে যদি ইঞ্জিলের ন্যায় এই শিক্ষা দেওয়া হত যে, একগালে চড় খেয়ে অপর গাল পেতে দিবে বা নিজের সমস্ত ধন-সম্পদ সর্বস্ব বিলিয়ে দিবে, তবে এর পরিণামে তারাও বাস্তবায়নের অযোগ্য এই শিক্ষার কারণে খৃষ্টানদের মতই আধ্যাত্মিক পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকত।

কিন্তু কুরআন শরীফ মানুষকে তার প্রকৃতি অনুসারে ক্রমবিকাশের পথে চালিত করে। ইঞ্জিলের উপমা সেই বালকের মত যাকে পাঠশালার প্রারম্ভেই এক দুর্বোধ্য পুস্তক পড়তে বাধ্য করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা মহাপ্রজ্ঞাময়। তাঁর প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে শিক্ষা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করাই বিধেয়।

এরপর মুত্তাকিদের জন্য তিনি বলেছেন- وَالَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَیۡکَ وَمَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِکَ ۚ وَبِالۡاٰخِرَۃِ ہُمۡ یُوۡقِنُوۡنَ (বাকারা: ৫)

অর্থাৎ মুত্তাকি সেই ব্যক্তি যে পূর্বের এবং তোমার উপর অবতীর্ণ হওয়া গ্রন্থের উপর ঈমান আনে। এবং পরকালেও বিশ্বাস রাখে। এটিও সংগ্রাম ও সাধনা থেকে মুক্ত নয়। এই পর্যায়ে ঈমান এখনও ঈষৎ পর্দাবৃত অবস্থায় থাকে। মুত্তাকির দৃষ্টিশক্তিতে তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব প্রকট থাকে। এমন ব্যক্তি শয়তানে সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনওক্রমে একটি মৌলিক বিষয়ের উপর ঈমান আনতে সক্ষম হয়। বর্তমানে অনুরূপ অবস্থা আমাদের জামাতের। তারাও ঈমান এনেছে ঠিকই, কিন্তু অচিরেই এই জামাত আল্লাহ্‌র হাতে উন্নতির কোন শিখরে উপনীত হবে, সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। সুতরাং এই প্রকারের ঈমান পরিশেষে ফলপ্রসু হয়।

সাধারণ অর্থে 'ইয়াকিন' (বিশ্বাস) শব্দ যখন ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিশ্বাসের নিম্নতম মানকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ জ্ঞানের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে 'ইলমুল ইয়াকিন' (জ্ঞানলব্ধ বিশ্বাস) কে বোঝানো হয়েছে। এই পর্যায়ে সে পুণ্যের অধিকারী হয়। কিন্তু এর পর ক্রমান্বয়ে পুণ্যের ধাপ অতিক্রম করে সে 'আইনুল ইয়াকিন' (চাক্ষুষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্বাস) ও 'হাক্কুল ইয়াকিন' (নিশ্চিত বিশ্বাস)-এর মর্যাদায় উপনীত হয়।

তাকওয়া বা পুণ্য কোন সাধারণ বিষয় নয়। কারণ এই পুণ্যের মাধ্যমেই সেই সকল শয়তানী কুমন্ত্রনার মোকাবেলা করতে হয়, যা মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর প্রভুত্ব করে বসেছে। 'নফসে আম্মারা' (অবাধ্য প্রবৃত্তি) রূপে এই সমস্ত

এরপর ৮ এর পাতায়..

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জার্মান সফর, অক্টোবরর, ২০১৮

(পূর্ববর্তী সংখ্যা ১১-এর পর)

কল্পনা করে দেখুন, যদি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি এই ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তবে সেই সমাজ কতই না শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হবে। যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের লাভের পরিবর্তে সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করবে। ভিন্ন বাক্যে এটিই প্রকৃত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা হবে। যদি কেউ দেখতে চায় যে ইসলাম কি উপস্থাপন করে, তবে তাকে এমন মানুষদের দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে হবে যারা নিজেরাই ভেদাভেদের শিকার এবং অন্যায়ভাবে অসহিষ্ণুতাকে ইসলামের প্রতি আরোপ করে। এবং এর পরিবর্তে এই সকল উন্নত দৃষ্টান্তের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সময়ের দাবি হল আমরা মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে নিজেদের কর্মের পরিণাম নিয়ে যেন বিশ্লেষণ করি। আজ পৃথিবীর গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হওয়া এবং দ্রুত যাতায়াত ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই। কিন্তু এই অগ্রগতির পাশাপাশি আমাদেরকে একথাও উপলব্ধি করতে হবে যে, পৃথিবীর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর যে কোন অংশে যখনই মানুষ নির্যাতন ও উৎপীড়নের শিকার হয়, তখন আন্তজার্তিক সমুদায়কে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসা উচিত। যুদ্ধরত দুটি পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজটিকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আর তা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেই সমস্ত মানুষদের জন্য আমাদেরকে উদার হতে হবে, যারা প্রকৃতপক্ষেই যুদ্ধ-কবলিত। এমন প্রকৃত শরণার্থীদেরকে কখনওই প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয় যারা অকারণে জুলুম ও অত্যাচারের লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে। কোনও সমাজেরই সেই সমস্ত নিরীহ মানুষদেরকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার যেন না থাকে, যারা শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করতে চায় এবং সে দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে বদ্ধপরিকর। অধিকন্তু যাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে, যাদেরকে অশেষ যাতনা দেওয়া হয়েছে আর যারা নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় রয়েছে, তাদের জন্য আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসুন আমরা সকলে মিলে মানবতা প্রতিষ্ঠিত করি। আসুন আমার সম্প্রীতি ও ভালবাসা প্রদর্শন করি। আসুন আমরা তাদের সাহায্যের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করি এবং তাদের দুঃখ-যন্ত্রনা ভাগ করে নিই, যাদের এর ভীষণ প্রয়োজন। অপরদিকে নতুন দেশে এসে মুহাজির বা অভিবাসীদের উপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। নতুন সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং এতে সমন্বিত হওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করা তাদের কর্তব্য। পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা তাদের উচিত নয়, আর স্থানীয় মানুষদের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করে নেওয়া উচিত নয়। বরং নিজের নতুন বাসগৃহের উন্নতি ও ক্রমাগত অগ্রগতির জন্য কাজ করতে হবে। পরস্পর মিলিত হয়ে আমাদেরকে এমন এক পন্থা বের করতে হবে যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সংস্কৃতির মানুষের সহাবস্থান সম্ভব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, পৃথিবী এক বিশ্বপল্লীর রূপ ধারণ করেছে। আমরা এখন অতীতের সেই যুগকে পিছনে ফেলে এসেছি, যখন কোন একটি দেশে কোন ঘটনা ঘটলে তা কেবল সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরকেই প্রভাবিত করত, কিম্বা খুব বেশি হলে এর প্রভাব পার্শ্ববর্তী কোন দেশের উপর পড়ত। এখন আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি যেখানে কোনও একটি দেশে সংঘটিত বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার পরিণাম সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে। এই কারণেই পরস্পরের বিষয়ে ভয়-ভীত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের উচিত বিভিন্ন সমস্যাকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করা। আমরা পৃথিবীর প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করব, আমাদের লক্ষ্য এর থেকে কোনওভাবেই যেন কম না হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সর্বদা এটিই লক্ষ্য থেকেছে আর এর জন্য সব সময় প্রচেষ্টারত রয়েছে। অতএব মৌলিক বিষয় হল শান্তি, আর এর জন্য এই দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন যে, আমরা সকলে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। তিনিই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এইভাবে আমরা তাঁকে চিনব এবং পরস্পরের অধিকার প্রদান করব। আমাদের বিশ্বাস, যদি প্রত্যেক মানুষ এই বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প হয়,তবে প্রকৃত ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। পরিতাপের বিষয়, আমরা ঠিক এর বিপরীতটি লক্ষ্য করছি। খোদার তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে পরস্পরের কাছাকাছি আসার পরিবর্তে শন্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কেবল জাগতিক উপায় উপকরণ অবলম্বন করছে। দিন প্রতিদিন মানুষ ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণাম আমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কেবল খোদা তা'লার উপর বিশ্বাস স্থাপনই আমাদের মুক্তির একমাত্রই যার মাধ্যমে দেশীয় ও আন্তঃদেশীয় স্তরে শান্তি স্থাপন করা যেতে পারে। এই কারণে এটি আমার প্রবল বাসনা এবং প্রার্থনা যে, জগতবাসী যেন নিজেদের স্রষ্টাকে চেনে এবং তাঁর প্রকৃত শিক্ষার অনুসরণ করে। আজ আমি অনুরোধ করব, আমরা যেন ব্যক্তিস্বার্থ ও রাজনৈতিক স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির অধিকার প্রদানের বিষয়ে সচেষ্ট হই। আমি দোয়া করি, মানুষ ও খোদার মধ্যে ব্যবধান যেন ঘুঁচে যায়। একমাত্র তখনই আমরা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখব। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্যালেস্টাইন, জার্মানীতে বসবাসরত আলবেনিয়ান সদস্য আরব অতিথি ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সর্বপ্রথম প্যালেস্টাইনের একটি পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেখান থেকে তিন বোন- সামাহ আব্দুল জলীল, আমাল আব্দুল জালীল এবং সেহার মাহমুদ নিজেদের সন্তানদের নিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। আমাল আব্দুল জলীল এবং সেহার মাহমুদ আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে তাদের স্বামীরা তালাক দিয়েছে। এই দুই বোনের এক-তৃতীয়াংশ ওসীয়্যত ও রয়েছে। এঁরা গত বছর জার্মান জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এবছর তাঁদের কাছে সফরের জন্য হাতে বেশি অর্থও ছিল না। তাই তাঁরা খরচ বাঁচাতে দীর্ঘ ও কষ্টদায়ক পথ পেরিয়ে এসেছেন। সঙ্গে তাদের সন্তানরাও ছিল। কারণ খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত করার উদগ্র বাসনা ছিল। এঁরা প্যালেস্টাইনের অধিবাসীনি। সেখান থেকে বাসে করে আম্মান (আদানের খাড়ি) পোঁছন। তারপর সেখান থেকে জাহাজে করে গ্রীস পৌছন। গ্রীস থেকে সাইপ্রাস এবং সেখান থেকে জাহাজে করে কোপেনহেগান (ডেনমার্ক) পৌছন। এরপর ডেনমার্ক থেকে জাহাজে করে বার্লিন এবং বার্লিন থেকে স্টার্টগার্ট শহরে পৌছন। এরপর সেখান থেকে আরও দুই তিন ঘন্টার পথ পেরিয়ে ফ্রাঙ্কফোর্টের বায়তুস সুবুহ মসজিদে পৌছন। পুনরায় এখান থেকে দুই ঘন্টার সফর করে জলসা গাহ কালসারবে আসেন।

তাঁরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন- আমরা অবিরাম দেড় দিন সফর করার পর এখানে পৌঁছেছি। আমরা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

সামাহ সাহেবা তিন বোনের পক্ষ থেকে কথা বলা আরম্ভ করেন। হুযুর স্নেহের ছলে জিজ্ঞাসা করেন তুমিই কি সকলের প্রতিনিধিত্ব করবে। এতে সামাহ সাহেবা বলেন, গত বছর আমরা প্রত্যেকে কথা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু কেউই বেশি কথা তুলে ধরতে পারি নি। হুযুর বলেন, যে কথাগুলি গত বছর বলা হয় নি সেগুলিও বলে নিন।

সামাহ সাহেবা বলেন, আমি মহম্মদ আলাওয়ান-এর স্ত্রী। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন- আপনাদের তো অনেক খ্যাতি রয়েছে। (এই দম্পতিকে ধর্মত্যাগী আখ্যা দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে। বর্তমান ফিলিস্তিনি মিডিয়ায় এই বিষয়টি নিয়ে তুমুল হৈ-চৈ রয়েছে। আর সোশাল মিডিয়াতে হাজার হাজার মানুষ এসম্পর্কে অবহিত।)

দ্বিতীয় বোন সেহার সাহেবা বলেন, হুযুর! এই মামলাটির জন্যও দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হ্যাঁ, আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা ফযল করুন। (সেহারকে ধর্মত্যাগীনী আখ্যা দিয়ে তার স্বামী তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে যাতে স্বামীকে কোন প্রকার অধিকার না দিতে হয়। প্রথমে আদালত তাকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিয়েছিল। সম্প্রতি পুনরায় ধর্মচ্যুত বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

তৃতীয় বোন আমাল জলীল সাহেবা বলেন, আমি বড় ছেলেকে সঙ্গে করে এনেছি যাতে আহমদীয়াতের সত্যতা তার কাছে উন্মোচিত হয়, সে অ-আহমদী।

হুযুর আনোয়ার (আই) বলেন: সবশেষে সকলের উপর প্রকৃত সত্য অবশ্যই উন্মোচিত হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) জাসিম নামক সেই যুবককে জিজ্ঞাসা করেন, জলসা কেমন লাগল? এতে সে উত্তর দেয়, জলসা খুব ভাল ছিল। কোনও কিছুই অনৈসলামিক ছিল না, কিন্তু আমার অনেক প্রশ্ন আছে। অনুমতি দিলে একটি প্রশ্ন করব। হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রশ্ন করুন।

সে প্রশ্ন করে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) 'আত-তবলীগ' পুস্তকে আরববাসীদেরকে বড় বড় উপাধি দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তিনি তাদেরকে 'আসফিয়া' 'আতকিয়া' ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু আরববাসীরা আজও পর্যন্ত তাঁকে গ্রহণ করে নি।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আরবদের মধ্যে অনেক পুণ্যবান মানুষ রয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাদেরকে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন, যে পুণ্যবান হবে সে, অবশেষে তাকে আসতেই হবে।' এখন তারা যদি না

এরপর ৮ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

“তোমরা খোদার জান্নাতের উত্তরাধিকারী হবে যা তাঁর সকল পুরস্কাররাজির থেকে শ্রেয়।”

আমি নিজের জন্য কেবল এতটুকুই চাই যে, যেভাবে তোমরা নিজেদের প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর, অনুরূপভাবেই প্রয়োজনে আমার সঙ্গে এই আচরণ করো।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তমান প্রতীক মহানবী (সা.)-এর বদরী সাহাবাগণ।

হযরত সায়েব বিন উসমান, হযরত যামরা বিন আমর জুহনী, হযরত সাআদ বিন সুহায়েল, হযরত সাআদ বিন উবায়েদ, হযরত সাহাল বিন আতিক, হযরত সুহায়েল বিন রাফে এবং হযরত সাআদ বিন খায়সামা রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন-এর পবিত্র জীবনালেখ্য সম্পর্কে আলোচনা।

সাহাবাগণের জীবনীর প্রেক্ষাপটে ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় উকবার বয়আত, আঁ হযরত (সা.)-এর মদিনা হিজরত করার পর মসজিদ নববী নির্মাণ, হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর শাহাদত বরণ এবং জিসরের যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

আল্লাহ তা'লা এই সমস্ত সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নত করতে থাকুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৫ মার্চ, ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১ আমান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ যে সমস্ত সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তাদের মধ্যে প্রথম হলেন হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.)। তিনি বনু জামাহ গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি হলেন উসমান বিন মাযউন (রা.)-এর পুত্র। তাঁর মাতার নাম ছিল হযরত খওলা বিনতে হাকীম। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। হযরত সায়েব বিন উসমান নিজ পিতা ও চাচা হযরত কুদামা (রা.)-এর সঙ্গে ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশগ্রহণ করেন। মদিনা হিজরতের পর আঁ হযরত (সা.) হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) এবং হারেসা বিন সুরাকা আনাসারী (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) -এর তিরন্দাজগণের মধ্যে তাঁর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত সায়েব বিন উসমান (রা.) বদর, ওহদ, খন্দক ও অন্যান্য সকল যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৬-৩৯৭, দারুল কুতুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

বুয়াতের যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.) তাঁকে মদীনার আমীর নিযুক্ত করেন। বুয়াতের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২য় হিজরীতে। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব লেখেন-

রবিউল আওয়াল মাসের শেষের দিকে বা রবিউল সানি মাসের প্রারম্ভে আঁহযরত (সা.) কুরায়েশদের পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হন। যার ভিত্তিতে তিনি স্বয়ং মুহাজিরদিরদের একটি দল নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। অপর দিকে নিজের অবর্তমানে উসমান বিন মাযউন (রা.)কে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি (সা.) কুরায়েশদের কোন হদীস পান নি। যে কারণে ‘বুয়াত’ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে ফিরে আসেন।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ রচিত, ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৯)

বুয়াত মদীনা থেকে আটচল্লিশ মাইল দূরে অবস্থিত জুহাইনা গোত্রের একটি পর্বতের নাম।

(সুবুলুল হুদা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫, দারুল কুতুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত সায়েব বিন উসমান ইমামার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইমামার যুদ্ধ হযরত আবু বাকার (রা.)-এর খিলাফতকালে ১২ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

পরবর্তী যে সাহাবী স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত জামরা বিন আমর জুহনী। হযরত জামরা (রা.)-এর পিতার নাম ছিল আমর বিন আদি। অনেকে তাঁর পিতার নাম বিশর বলেও উল্লেখ করেছেন। তিনি বনু তারিফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। অপরদিকে অনেকের মতে তিনি বনু সাআদা গোত্রের মিত্র ছিলেন, যেটি ছিল সাআদ বিন উবাদা গোত্র। মিত্রের অর্থ হল তাদের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি ছিল, যার ভিত্তিতে প্রয়োজনে তারা পরস্পরের সহায়তার জন্য দায়বদ্ধ ছিল। আল্লামা ইবনে আসীর উসদুল গাবায় লিখেছেন, এটি কোন বিবাদের বিষয় নয়, কেননা, বনু তরীফ বনু সাআদারই একটি শাখা। হযরত জামরা বদর ও ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ওহদের যুদ্ধে শহীদ হন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি বলেন সাআদ বিন সোহেল (রা.)। হযরত সাআদ আনসারী সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অনেকে তাঁর নাম সাঈদ বিন সোহেল বর্ণনা করেছেন। হযরত সাআদ বদর ও ওহদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁর এক কন্যা ছিল যার নাম ছিল হুযাইলা।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

এর পরের সাহাবী হলেন হযরত সাআদ বিন উবায়েদ (রা.)। ইনি বদরী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত সাআদ বিন উবায়েদ বদর, ওহদ ও খন্দক সমেত সকল যুদ্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর অপর এক নাম ছিল সাঈদ। তিনি ‘ক্বারী’ হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবু যায়েদ। হযরত সাআদ বিন উবায়েদ সেই চারজন আনসার সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত যারা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে কুরআন একত্রিত করেছিলেন। তাঁর পুত্র উমায়ের বিন সাআদ হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কালে সিরিয়ার একটি প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত সাআদ বিন উবায়েদ আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে কুবা মসজিদে ইমামতির কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হযরত আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) -এর যুগেও তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হযরত সাআদ বিন উবায়েদ (রা.) হিজরতের ষোড়শতম বছরে কাদিসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪ বছর।

আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ১৩ হিজরতিতে সংঘটিত জিসরের যুদ্ধে মুসলানেরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল।

হযরত সাআদ বিন উবায়েদ পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন, পশ্চাদগমণ করেছিলেন। সেই সময় হযরত উমর হযরত সাআদ বিন উবায়েদকে বলেন, “সিরিয়ায় জিহাদের আগ্রহ আছে কি? ” তাঁকে প্রশ্ন করেন। সেখানে মুসলমানদের প্রবল রক্তক্ষয় হয়েছে। মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করা হয়েছে। তোমার আগ্রহ থাকলে সেখানে চলে যাও। শত্রুদের দ্বারা এমন রক্তপাতের কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তার ফলে শত্রুদের দুঃসাহস অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলেন, আপনি হয়তো নিজের উপর পরাজয়ের দুর্নাম ঘুঁচানোর সুযোগ পাবেন। ” কেননা জিসরের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুসলমানদের বিপুল ক্ষতি হয়েছিল। তাই হযরত উমর বললেন, যদি পরাজয়ের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে হয়, তবে সিরিয়ায় যে যুদ্ধ হচ্ছে (সেখানে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুন) হযরত সাআদ উত্তর দিলেন- ‘না’ । আমি সেই ভূ-খণ্ড ছেড়ে অন্য কোথাও যাব না, যেখান থেকে আমি পলায়ন করেছি বা ব্যর্থ হয়ে ফিরেছি। আর সেই সমস্ত শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হব যারা আমার সঙ্গে যা করার করেছিল। অর্থাৎ এখানে বোঝানো হয়েছে যে, যুদ্ধে তারা জয়যুক্ত হয়েছিল। অতঃপর হযরত সাআদ বিন উবায়েদ কাদিসিয়া আসেন এবং সেখানে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন। আব্দুর রহমান বিন আবু লায়লা বর্ণনা করেন যে, হযরত সাআদ বিন উবায়েদ লোকেদের উদ্দেশ্যে উপদেশবাণী দিয়ে বলেন, আমরা কাল শত্রুদের মোকাবিলা করব আর কালকে আমরা শহীদ হব। তোমরা আমাদের দেহ থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলো না বা পরনের পরিধান ছাড়া অন্য কোন কাফন দিও না। ”

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল:১৯৯৫)

জেসরের যুদ্ধের কিছুটা ব্যাখ্যা পূর্বের একটি খোতবায় আমি করেছি, সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরোও কিছুটা বর্ণনা করছি। যেমনটি আমি বর্ণনা করেছি যে, জেসরের যুদ্ধ ফোরাত নদীর তীরে মুসলমান ও ইরানীদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন হযরত আবু উবাইদ সাকফি (রা.) আর ইরানীদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন বাহ্‌মান জাদওয়ায়িহ্‌। মুসলমান সৈন্যদের সংখ্যা দশ হাজার ছিল অপরদিকে ইরানী সৈন্যদলে ছিল ত্রিশ হাজার সৈন্য ও তিন শত হাতি। ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী স্থানে এসে যাওয়ার জন্য দুই পক্ষ কিছুদিনের তরে যুদ্ধ বিরতি রাখে। এমনকি দুইপক্ষের সম্মতিপূর্বক সিদ্ধান্তে ফোরাতের উপর জেসর অর্থাৎ একটি সেতু নির্মিত হয়। এই সেতুর কারণে এটাকে জেসরের যুদ্ধ বলা হয়। সেতু নির্মাণের পর বাহমান জাদওয়ায়িহ্‌ হযরত আবু উদাইদ (রা.)কে বলে পাঠান যে, তুমি নদী অতিক্রম করে আমাদের দিকে আসবে নাকি আমাকে অতিক্রম করার অনুমতি দেবে। হযরত উদাইদ (রা.)-র সিদ্ধান্ত ছিল যে, মুসলমান সৈন্য নদী অতিক্রম করে বিরোধী পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ করুক। কিন্তু সৈন্যদলের সেনাপতিদের মধ্যে হযরত সালিতও ছিল যে কিনা এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিল। কিন্তু হযরত উদাইদ (রা.) ফোরাত নদী অতিক্রম করে পারসিক সেনাদের উপর আক্রমণ হানে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত লড়াই এরূপভাবে চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাহমন জাদওয়ায়িহ তার সৈন্যসামন্তদের ছত্রভঙ্গ হতে দেখেন। তিনি দেখেন যে, ইরানী সৈন্য পিছু হটছে, তখন তিনি হাতিগুলিকে অগ্রসর করার আদেশ দেন। হাতিদের অগ্রসর হওয়াতে মুসলমানদের লাইন এলামেলো হয়ে যায়। ইসলামী সেনা এদিক সেদিক সরে যেতে থাকে। হযরত উদাইদ (রা.) মুসলমানদের বলে, হে আল্লাহর বান্দারা! হাতিদের উপর আক্রমণ কর এবং তাদের শুঁড় কেটে ফেল। হযরত উদাইদ (রা.) এই কথা বলার পর নিজে অগ্রসর হয়ে একটি হাতির উপর আক্রমণ চালিয়ে তার শুঁড় কেটে ফেলে। বাকী সৈন্যরাও এই দেখে দ্রুততার সহিত লড়াই আরম্ভ করে দেয় এবং অনেক হাতির শুঁড় ও পা কেটে তাদের আরোহীদেরকে হত্যা করে। ঘটনাক্রমে হযরত উদাইদ (রা.) একটি হাতির সামনে আসে। তিনি (রা.) লড়াই করে তার শুঁড় কেটে দেন কিন্তু তিনি ঐ হাতীর পায়ের তলায় এসে পদপিষ্ট হয়ে শহীদ হয়ে যান। হযরত উদাইদ (রা.) এর শাহাদাতের পর সাতজন ব্যক্তি পালাক্রমে ইসলামী পতাকা রক্ষার্থে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে যান। অষ্টম ব্যক্তি হযরত মুশান্না (রা.) ছিলেন, যিনি ইসলামী পতাকা নিয়ে আরোও একবার পূর্ণ উদ্যমের সহিত আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু ইসলামী সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল এবং লোক পর পর সাতজন নেতাকে শহীদ হতে দেখে এদিক সেদিক পালাতে আরম্ভ করে, শুধু তাই নয় কিছু তো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত মুশন্না (রা.) এবং তাঁর সাথী বীরত্বের সহিত লড়াই করেন। অবশেষে হযরত মুশন্না (রা.) আহত হন আর তিনি লড়াই করতে করতে ফোরাত নদী অতিক্রম করে ফিয়ে আসেন। এই ঘটনায় মুসলমানদের অনেক বেশী ক্ষতি হয়। মুসলমানদের চার হাজার সৈন্য শহীদ হয় অন্যদিকে ছয় হাজার ইরাণী সৈন্য মারা যায়।

(তারিখ ইবনে খুলদুন সংগৃহীত, অনুবাদ- হাকীম আহমদ হোসেন, এলাহাবাদী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৭০-২৭৩, দারুল এশায়াত করাচী থেকে ২০০৩ সালে প্রকাশিত)

যাইহোক এই যুদ্ধ এই জন্য হয়েছিল যে, ইরানীদের পক্ষ থেকে বার বার আক্রমণ হচ্ছিল আর এই আক্রমণ বন্ধ করতে এই যুদ্ধের অনুমতি নেওয়া হয়েছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তিনি হলেন হযরত সাহাল বিন আতিক (রা.) তাঁর নাম সুহায়েল ও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তাঁর মায়ের নাম ছিল জমিলা বিনতে আলকামা। হযরত সাহাল আতিক সত্তর জন আনসারের সহিত বয়আতে উকবা সানিয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন পেয়েছেন।

(তবকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৮৭, সাহাল বিন আতিক, দারুল কুতুবুল আলমিয়াহ বেরুত ১৯৯০) (উসদুল গাবাতাহ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫৭৮, সাহাল বিন আতিক, দারুল কুতুবুল আলমিয়াহ্‌ বেরুত ২০০৩)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাঁর নাম সুহায়েল বিন রাফে।

হযরত সুহাল বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। যে ভূ-খণ্ডের উপর মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছিল সেটি তিনি ও তাঁর ভাই সাহালের সম্পত্তি ছিল। তাঁর মাতার নাম ছিল যুগাইবা বিনতে সাহল। হযরত সুহায়েল বদর, ওহদ এবং খন্দক সমেত সমস্ত যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

(তবকাতুল কুবরা ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭২, সাহাল বিন আতিক, দারুল কুতুবুল আলমিয়াহ্‌ বেরুত ১৯৯০)

আঁ হযরত (সা.) এর মদীনা হিজরতের বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (আ.) যা লিখেছেন তা উপস্থাপন করছি, তিনি (আ.) লেখেন যে,

“যখন তিনি (সা.) মদীনা প্রবেশ করেন প্রতিটি মানুষের ইচ্ছা এটাই ছিল যে, তিনি যেন তাঁর ঘরে অবস্থান করেন। যে গলির মধ্য দিয়ে তাঁর উট অতিক্রম করত সেই গলির বিভিন্ন গোত্র নিজের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ (সা.)কে স্বাগত (অভ্যর্থনা) জানাত এবং বলতেন হে আল্লাহর রসূল (সা.) এটা আমাদের বাড়ি, এই আমাদের সম্পদ এবং এই আমাদের প্রাণ সমূহ, যা আপনার সেবার জন্য উপস্থিত। হে আল্লাহর রসূল (সা.) আমরা আপনার রক্ষা করতে সামর্থ রাখি। আপনি আমাদের মাঝে অবস্থান করুন। কিছু লোক অত্যন্ত আবেগ প্রণোদিত হয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁর উটনীর গলার দড়ি ধরে নিত যাতে তাঁকে নিজেদের ঘরে নামিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তিনি (সা.) প্রত্যেককেই এই উত্তর দিতেন যে, “আমার উটনীকে ছেড়ে দাও, এ আজ খোদাতা’লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট (যা তার প্রতি আদেশ হবে এমনটাই মনে কর যে, আল্লাহতা’লা যেখানে চাইবে সেখানে এ বসে যাবে।)” এ সেখানে দাঁড়িয়ে পড়বে যেখানে আল্লাহতা’লা ইচ্ছাপোষণ করবে। অবশেষে মদীনার এক প্রান্তে বনু নাজ্জারের এতীমদের এক ভূমির পাশে গিয়ে উটনী দাঁড়িয়ে পড়ে। তিনি (সা.) বলেন, “খোদাতা’লার ইচ্ছা এটি মনে হয় যে, আমরা এখানে অবস্থান করি। আরো বলেন ভূমিটি কার? ” ভূমিটি কিছু এতীমদের ছিল। তাদের অভিভাবক অগ্রসর হয়ে বলেন যে, “হে আল্লাহর রসূল (সা.)! এটি অমুক অমুক এতীমের ভূমি। আর আপনার সেবার জন্য উপস্থিত।” তিনি বলেন, “আমি কারোর সম্পত্তি বিনা মূল্যে নিতে পারি না।” অবশেষে তার মূল্য নির্ধারণ হয় এবং তিনি সেই জায়গায় মসজিদ ও নিজ বাস গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন।” [ভূমিকা তফসিরুল কোরআন- আনওয়ারুল‌ুলুম, ২০তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২২৮]

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব (রা.) এর ব্যাখ্যা ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন (সা.)’-এ কতকটা এরূপভাবে লিখেছেন যে, “মদীনায় অবস্থানের পর সর্বপ্রথম কাজ ছিল মসজিদ নববীর ভিত্তি স্থাপনা। যে জায়গায় তাঁর উটনী এসে বসে পড়েছিল তা মদীনার দুই মুসলমান বালক সাহাল ও সুহায়েল এর সম্পত্তি ছিল, যা হযরত আসয়াদ বিন জারারাহ (রা.) এর পর্যবেক্ষণাধীনে ছিল। ইহা

রসুলের বাণী

কেবল মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার করা কোন মূল্য রাখে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ় সংকল্প হয়ে সেই বয়াতের উপর আমল না করা হয়।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১০)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত
আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

একটি অনুর্বর জায়গা ছিল অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফলা ও চাষাবাদের অযোগ্য। যার একটি অংশে কোথাও কোথাও একটা দুটো খেজুর গাছ লেগে ছিল। আর অন্য অংশে কিছু পরিত্যক্ত জীর্ণ অট্টালিকা ইত্যাদি ছিল। পড়ে যাওয়া বাড়ি ছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার চিহ্ন ছিল। আঁ হযরত (সা.) উহাতে মসজিদ ও নিজ কুঠি নির্মাণের জন্য পছন্দ করেন এবং দশ দিনার দিয়ে এ জায়গা কিনে নেন এবং গাছ পালা কেটে সমান করে মসজিদ নববী (সা.)-এর ভিত্তি স্থাপনা আরম্ভ শুরু হয়। " [হযরত সাহেবজাদা বশির আহমদ সাহেব এম. এ. রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন (সা.)' হতে সংগৃহীত, পৃষ্ঠা : ২৬৯]

একটি বর্ণনানুসারে এই ভূমির যে মূল্য তা হযরত আবুবকর (রা.) পরিশোধ করেছিলেন। [শারাহ্ জারকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৮৬, দারুল কুতুবুল আলমিয়াহ্, বেরুত ১৯৯৬]

আরো লেখেন যে, জায়গাটি সমান করে, গাছ-পালা কেটে মসজিদ নববী (সা.)-এর নির্মাণ কার্য শুরু হয়, আঁ হযরত (সা.) নিজে দোয়া করতে করতে এর ভিত্তি রচনা করেন । আর যেমনটি কুবার মসজিদে হয়েছিল সাহাবা (রা.) মিস্ত্রী ও শ্রমিকের কাজ করেছে যাহাতে কখনও কখনও আঁ হযরত (সা.) নিজেও অংশ গ্রহণ করতেন। অনেক সময় ইঁট উঠানোর সময় সাহাবারা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহ্ আনসারীর এই কবিতা পড়ত যে, هَذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَر، هَذَا أَبَرُّ رَبَّنَا وَأَطْهَرُ অর্থাৎ বোঝা খায়বারের ব্যবসা বানিজ্যের মালের বোঝা নয়, যা পশুর পিঠে চাপিয়ে এসে থাকে। বরং হে আমার মওলা! এই বোঝা তাকওয়া ও পবিত্রতার বোঝা, যা আমরা তোমার সন্তুষ্টির কারণে বহন করি। অনেক সময় সাহাবাগণ কাজ করতে করতে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহার এই পঙক্তি পাঠ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْاَجْرَ اَجْرُ الْاٰخِرَه، فَارْحَمِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَه

অর্থাৎ হে আল্লাহ! পরকালের প্রতিদানই প্রকৃত পুণ্যের প্রতিদান। অতএব, তুমি নিজ কৃপাগুণে আনসার ও মুহাজিরদের উপর রহমত বর্ষিত কর। সাহাবাগণ যখন এই পঙক্তি পাঠ করতেন, তখন অনেক সময় আঁ হযরত (সা.) তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাতেন। এইভাবে এক দীর্ঘকালের নিরলস পরিশ্রমের পর এই মসজিদ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মসজিদ ভবনটি পাথরের প্লেট ও ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল যাকে কাঠের স্তম্ভ দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছিল। সেই যুগে শক্তপোক্ত ভবনের জন্য কাঠের গুড়িকে স্তম্ভ হিসেবে ব্যবহার করে মাঝের স্থানগুলিতে ইট ও মাটির দেওয়াল নির্মাণ করার রীতি ছিল, যাতে দৃঢ়তা বজায় থাকে। এটি কাঠামো হিসেবে ব্যবহৃত হত, আর উপরে ছাদ হিসেবে খেজুরের ডালপালা বিছানো হয়েছিল। মসজিদের মধ্যে ছাদকে ধরে রাখার জন্য খেজুর গাছের স্তম্ভ দেওয়া হয়েছিল। আর যতদিন মেম্বার তৈরীর প্রস্তাব আসে নি, আঁ হযরত (সা.) খুতবার সময় এই স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি স্তম্ভকে অবলম্বন করে দাঁড়াতেন। মেম্বার সেই স্থানকে বলা হয় যেখানে আঁ হযরত (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান করতেন। মসজিদের মেঝে মাটির ছিল। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে যেহেতু ছাদ চুঁইয়ে পানি পড়ত, সেই কারণে বৃষ্টির সময় মসজিদের ভিতর কর্দমাক্ত হয়ে উঠত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কাঁকরের মেঝে তৈরী করা হয় এবং এতে ছোট ছোট পাথরের কুচি যোগ করা হয়। প্রারম্ভে মসজিদের অভিমুখ বায়তুল মুকাদ্দসের দিকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কিবলার অভিমুখ পরিবর্তনের আদেশ এলে সেটি কিবলামুখী করে দেওয়া হয়। মসজিদের উচ্চতা সেই সময় দশ ফুট ছিল। (ছাদ দশ ফুট উঁচুতে ছিল) মসজিদের দৈর্ঘ্য ১০৫ ফুট এবং প্রস্থ প্রায় ৯০ ফুট ছিল। পরবর্তীতে এটিকে আরও প্রশস্ত করা হয়। ১০৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৯০ ফুট প্রস্থের যে ক্ষেত্রফল দাঁড়ায় তা প্রায় পনেরো থেকে ষোলো শ' নামাযীদের স্থান সংকুলান হত।

মসজিদের এক কোণে ছাদবিশিষ্ট একটি বারান্দা নির্মিত হয়েছিল যেটিকে 'সুফফা' বলা হত। এটি সেই সকল দরিদ্র মুহাজিরদের জন্য ছিল যারা গৃহহীন ছিল। এরা এখানেই থাকতেন এবং এদেরকে আসহাবে সুফ্ফা বলা হত। তাদের কাজ ছিল দিন রাত আঁ হযরত (সা.)-এর সেবায় নিয়োজিত থাকা, ইবাদত করা এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। এদের স্থায়ী কোন উপার্জন ছিল না। আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং এদের খেয়াল রাখতেন। তাঁর (সা.) কাছে যখনই কোন উপহার সামগ্রী আসত বা বাড়িতে কিছু থাকত, তিনি (সা.) তাদের অংশ অবশ্যই পৃথক করে দিতেন। আঁ হযরত (সা.) স্বয়ং অধিকাংশ সময় তাদের আহারের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি অনেক সময় তিনি (সা.) নিজেই অভুক্ত থেকে ঘরের খাদ্যদ্রব্য আসহাবে সুফফাদের জন্য পঠিয়ে দিতেন। আনসারাও এদের আতিথেয়তার ক্ষেত্রে সাধ্যমত করতেন। তারা তাদের জন্য খেজুরের ছড়া এনে মসজিদে ঝুলিয়ে দিতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদেরকে চরম অভাব-অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত। অনেক সময় অনাহারেই কাটাতে হত। পরপর কয়েক বছর এমন অবস্থা চলতে থাকে, অবশেষে মদিনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাদের মধ্যে কতকের কর্মসংস্থান হয়। শ্রমিক হিসেবে কাজ পেতে থাকেন এবং কতক ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল থেকে অনুদান পেতে আরম্ভ করেন। অর্থাৎ অবস্থার উন্নতি ঘটলে তাদেরকে সহায়তা করা হয়।

আঁ হযরত (সা.)-এর বসবাসের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি বাড়ি তৈরী করা হয়। বাড়ি বলতে দশ-পনেরো ফুট ছোট্ট একটি কক্ষ ছিল আর সেই কক্ষ ও মসজিদের মাঝে একটি দরজা রাখা হয়েছিল যার মধ্য দিয়ে তিনি মসজিদে নামাযের জন্য যাতায়াত করতেন। আঁ হযরত (সা.) একাধিক বিবাহ করার পর এই কক্ষের সঙ্গেই আরও কয়েকটি কক্ষও তৈরী করা হয়। মসজিদের আশেপাশে আরও কয়েকজন সাহাবাদের জন্য বাড়ি তৈরী করা হয়।

এটিই ছিল মসজিদ নববী যা মদিনায় নির্মিত হয়েছিল। যেহেতু সেই যুগে কোন সাধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার যোগ্য এমন কোন ভবন ছিল, সেই কারণেই এই মসজিদটি সরকারি বা প্রশাসনিক ভবন হিসেবেও ব্যবহৃত হত। এটিই অফিস ছিল আর ছিল সরকারের সম্পূর্ণ সেক্রেটারিয়েট। এখানেই আঁ হযরত (সা.) বিভিন্ন মিটিং ও বৈঠক করতেন আর যাবতীয় প্রকারের পরামর্শ ও আলোচনা হত। এখানেই বিভিন্ন মামলা-মোকাদ্দমার বিচার করা হত বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হত। এটি জাতীয় অতিথিশালা হিসেবেও ব্যবহৃত হত। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কাজ এই মসজিদ থেকেই পরিচালিত হত। প্রয়োজনে যুদ্ধবন্দীদেরকেও এখানে রাখা হত। অনেক বন্দী এমনও ছিল যারা মুসলমানদের ইবাদত করতে দেখে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও প্রেমের বন্ধন দেখে নিজেরাই মুসলমান হয়ে গেছে। যাইহোক এ সম্পর্কে স্যার উইলিয়াম মিউরের লেখাও রয়েছে, যে একজন পাশ্চাত্যবিদ। ইসলাম ও আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু সে লিখেছে। কিন্তু এখানে সে এই ঘটনাটি সম্পর্কে লেখে-

' যদিও নির্মাণ সামগ্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে এই মসজিদটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং সাধারণ ছিল। কিন্তু হযরত মহম্মদ (সা.)–এর এই মসজিদ ইসলামের ইতিহাসে এক বিশেষ মর্যাদা রাখে। খোদর রসুল এবং তাঁর সাহাবা এই মসজিদেই নিজেদের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। এখানেই যথারীতি ও বা-জামাত আকারে ইসলামি নামাযের সূচনা হয়। এখানেই জুমার দিন মুসলমানেরা খোদার সদ্য অবতীর্ণ হওয়া ওহী শোনার জন্য শিষ্ট ভাবে একত্রিত হত যার কল্পনামাত্রই তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখত। এখানেই মহম্মদ (সা.) বিজয়ের পরিকল্পনাকে অন্তিম রূপ দিতেন। এই ভবনেই পরাজিত গোত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর সামনে উপস্থিত হত। এই দরবার থেকেই রাজকীয় আদেশ জারি হত যা আরবের দূর-দূরান্তে বিদ্রোহীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। অবশেষে এই মসজিদ সংলগ্ন নিজের স্ত্রী আয়েশার কক্ষেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর এখানেই তিনি তাঁর দুই খলীফার মাঝে সমাহিত আছেন।

এই মসজিদ ও সংলগ্ন কক্ষগুলি প্রায় সাত মাসের সময়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) নুতন গৃহে তাঁর স্ত্রী সওদা (রা.) নিয়ে প্রবেশ করেন। কিছু অন্যান্য মুহাজির সাহাবাগণও আনসার সাহাবাগণের কাছ থেকে জমি নিয়ে মসজিদের কাছাকাছি বাড়ি তৈরী করেন। কিন্তু যারা মসজিদের কাছাকাছি জমি পান নি, তারা দূরে বাড়ি তৈরী করেছেন। আবার অনেকে আনসারদের তৈরী করা বাড়িও পেয়ে যান।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন', পৃ: ২৬৯-২৭১)

যাইহোক হযরত সোহেল এবং তাঁর ভাই সেই সমস্ত সৌভাগ্যবান সাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের এই মহান কেন্দ্রে নিজেদের জমি দান করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)। তিনি অউস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল হিন্দ বিনতে আউস। হযরত আবু যাইয়াহ নুমান বিন সাবেত, যিনি একজন বদরী সাহাবী' তিনি মায়ের দিক থেকে তাঁর সহোদর ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তাঁর উপনাম ছিল আবু খায়সামা ও আব্দুল্লাহ। আঁ হযরত (সা.) হযরত সাআদ বিন খায়সামা এবং হযরত আবু সালমা বিন আব্দুল আসাদ (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৬-৩৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত সাআদ সেই বারো জন তত্ত্বাবধায়গণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে আঁ হযরত (সা.) উকবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় মদীনার মুসলমানদের

তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এই বারোজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়ার ঘটনা এবং তাদের নাম ও কাজ সম্পর্কে বর্ণনা করব যা সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব লিখেছেন।

১৩ নবুবীর যুল হজ্জ মাসে হজ্জের সময় অউস এবং খাজরাজ গোত্রের কয়েকশ মানুষ মক্কায় আসেন। তাদের মধ্যে সত্তর জন হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন বা মুসলমান হতে ইচ্ছুক ছিলেন। আর এরা মক্কায় আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। মুসআব বিন উমায়েরও তাদের সঙ্গে ছিলেন। মুসায়েব (রা.)-এর মাতা তখন জীবিত ছিল। সে মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুসায়েবকে ভীষণ ভালবাসত। পুত্রের আগমণের সংবাদ পেয়ে সে বলে পাঠাল যে, প্রথমে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে যাও। পরে অন্য কোথাও যেও। মুসআব উত্তর দেন, আমি এখনও রসুলে করীম (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করি নি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি আপনার কাছে আসব। এরপর তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে বিশেষ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে মায়ের কাছে যান। সে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বসে ছিল। তাঁকে দেখে অঝোরে কাঁদতে থাকে এবং অনেক অভিযোগ অনুযোগ করতে থাকে। মুসআব (রা.) বলেন– মা! আমি তোমাকে সুন্দর একটি কথা বলব যা তোমার জন্য অনেক কল্যাণকর। এটি যাবতীয় বিবাদের নিষ্পত্তি করবে। সে জিজ্ঞাসা করে, সেটি কি জিনিষ? মুসআব (রা.) মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলেন, মূর্তির উপাসনা বর্জন করে মুসলমান হয়ে যাও এবং আঁ হযরত (সা.)–এর উপর ঈমান আন। সে পাকা মুশরিক ছিল। একথা শোনামাত্র উচ্চস্বরে বলে উঠল- 'নক্ষত্রপুঞ্জের নামে শপথ করে বলছি, আমি তোমার ধর্মে কখনওই প্রবেশ করব না। সে নিজের আত্মীয়স্বজনদের উদ্দেশ্যে তাঁকে কয়েদ করার জন্য ইঙ্গিত করে, কিন্তু তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন।

যাইহোক হযরত মুসআব (রা.)-এর কাছ থেকে আঁ হযরত (সা.) আনসারদের আগমণের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই মূহুর্তে সম্মিলিত ও নির্জনে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল, এই কারণে হজ্জ প্রথা পূর্ণ হওয়ার পর যুল হজ্জ মাসের মাঝামাঝি একটি দিন নির্ধারণ করা হয়, যাতে সেদিন মধ্যরাত্রির কাছাকছি সময় এরা সকলে গত বছরের উপত্যকায় আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। উদ্দেশ্য ছিল মানসিক প্রশান্তি লাভ ও সম্মিলিতভাবে নির্জনে নিভৃতে কথাবার্তা বলা। আঁ হযরত (সা.) আনসারদেরকে তাকিদ সহকারে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, তারা যেন একত্রে না আসে, বরং দুই-একজন করে পূর্বনির্দিষ্ট সেই উপত্যকায় পৌঁছে যায়। কেননা, শত্রুদের দৃষ্টি পড়তে পারে। আর কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে তাকে যেন জাগানো না হয়, আর যে অনুপস্থিত তার জন্য যেন অপেক্ষা না করা হয়। অবশেষে সেই নির্ধারিত রাত্রির তৃতীয় পহরে আঁ হযরত (সা.) একাকি ঘর থেকে বের হলেন এবং পথে নিজের চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিলেন, যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি, মুশরিক ছিলেন। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) কে ভালবাসতেন। তিনি হাশিম গোত্রের সর্দার ছিলেন। যাইহোক তাঁরা দুজনে সেই উপত্যকায় পৌঁছে যান। কিছুটা সময় অতিবাহিত হতেই একে একে আনসারগণও সেখানে পৌঁতে আরম্ভ করেন। এরা ছিলেন সত্তর জন সাহাবা, যারা অউস ও খাজরাজ উভয় গোত্রের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। সর্বপ্রথম আব্বাস কথা বলা আরম্ভ করেন। অর্থাৎ হযরত আব্বাস যিনি এখনও ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি বললেন- হে খাজরাজ গোত্রের লোকসকল! মুহাম্মদ (সা.) নিজ পরিবারে একজন সম্মানীয় ও প্রিয় ব্যক্তি। সেই পরিবার আজ পর্যন্ত তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে এসেছে এবং প্রত্যেক বিপদের সময় তাঁর জন্য বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন মুহাম্মদ নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে তোমাদের কাছে চলে যেতে মনস্থির করেছেন। অতএব যদি তোমরা তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার বাসনা রাখ, তবে তোমাদেরকে তাঁর সমস্ত দিক থেকে নিরাপত্তার বিধান করতে হবে এবং সমস্ত শত্রুদের সামনে বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি তোমরা এর জন্য প্রস্তুত হও, তবে মঙ্গল, অন্যথায় এখনই পরিস্কারভাবে জানিয়ে দাও। কেননা, পরিস্কার কথাই উত্তম। বারাআ ইবনে মরুর নামে আনসারদের এক প্রভাবশালী ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বললেন, আব্বাস! আমরা তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা চাই হযরত রসুলে করীম (সা.) নিজেও কিছু বলুন আর তিনি (সা.) আমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করতে চান তা বর্ণনা করুন। এর উত্তরে আঁ হযরত (সা.) কুরআন করীমের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষা বর্ণনা করেন। হুকুকুল্লাহ এবং হুকুকুল ইবাদের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, আমি নিজের জন্য কেবল এতটুকুই চাই যে, যেভাবে তোমরা নিজেদের প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর, অনুরূপভাবেই প্রয়োজনে আমার সঙ্গে এই আচরণ করো। আঁ হযরত (সা.)-এর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর বারাআ ইবনে মারূর আরবের প্রথানুযায়ী মহানবী (সা.)-এর হাত নিজের হাতের মধ্যে ধারণ করে বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল! সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন! আমরা নিজের প্রাণের মত আপনাকে আগলে রাখব। আমরা তরবারির ছায়া পালিত হয়েছি। তাঁর এই কথার মধ্যেই সেখানে বসে থাকা আবুল হায়শাম বিন তাইয়ান নামক এক সাহাবী (যিনি সেই সময় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন) এবং আরও এক সাহাবী বলে উঠলেন- হে রসুলুল্লাহ (সা.) মদিনার ইহুদীদের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘকালের সম্পর্ক। আপনার সঙ্গ দিলে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আশঙ্কা হয় যে, আল্লাহ তা'লা আপনাকে বিজয় দান করলে আপনি আমাদের ছেড়ে মক্কায় ফিরে যাবেন। আর কোথাও আমাদের ঠাঁই হবে না। মহানবী (সা.) সহাস্যে উত্তর দিলেন, এমনটি কখনওই হবে না। তোমার রক্ত হবে আমার রক্ত। তোমার বন্ধু আমার যে, সে আমারও বন্ধু। অনুরূপে যে তোমার শত্রু সে আমারও শত্রু। একথা শুনে আব্বাস বিন উবাদা আনসারী নিজ সাথীদের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, হে লোক সকল! তোমরা কি এই অঙ্গীকারের অর্থ বোঝ? এর অর্থ হল তোমাদেরকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে- সে কৃষ্ণাঙ্গই হোক বা শ্বেতাঙ্গ। যে ব্যক্তিই আঁ হযরত (সা.)-এর বিরোধীতা করবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর প্রত্যেক প্রকারের ত্যাগ-স্বীকারে উদ্যত থাকতে হবে। লোকেরা উত্তর দিল, হ্যাঁ আমরা জানি। কিন্তু হে রসুলুল্লাহ্! এর পরিবর্তে আমরা কি পাব? লোকেরা পুনরায় আঁ হযরত (সা.) কে প্রশ্ন করল, আমরা তো সব কিছুই করব, কিন্তু বিনিময়ে কি পাব? আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন, প্রতিদানে তোমরা খোদার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর সকল পুরস্কারাজির থেকে সব থেকে বড় পুরস্কার। সকলে সমস্বরে উত্তর দিল আমরা এই বিনিময়ে সম্মত। হে রসুলুল্লাহ্! আপনি নিজের হাত প্রসারিত করুন। তিনি (সা.) নিজের পবিত্র হাত প্রসারিত করলে এই সত্তর জনের এই নিবেদিত দলটি একটি রক্ষণাত্মক অঙ্গীকারের বিনিময়ে তাঁর হাতে বিক্রি হয়ে যায়। এই বয়আতের নাম হল উকবার দ্বিতীয় বয়আত।

বয়আত পর্বের পর আঁ হযরত (সা.) বললেন, মূসা (আ.) নিজের জাতির মধ্য থেকে বারো জন রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করেছিলেন, যারা মূসার পক্ষ থেকে জাতির রক্ষক হিসেবে কাজ করত। আমিও তোমাদের মধ্য থেকে বারো জন রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করব, যারা তোমাদের রক্ষক হবে। তারা আমার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর শিষ্যদের মর্যাদা রাখবে এবং জাতি সম্পর্কে আমার সম্মুখে জবাবদিহি করবে। অতএব তোমরা যোগ্য ব্যক্তিদের নাম প্রস্তাব করে তা আমার সামনে উপস্থাপন কর। এই উদ্দেশ্যে বারো জন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হয় যাদেরকে তিনি (সা.) অনুমোদন দান করে এক একটি গোত্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে তাদের কর্তব্য বুঝিয়ে দেন। এছাড়াও কয়েকটি গোত্রের জন্য দুজন করে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। সেই বারোজন তত্ত্বাবধায়কের নাম নিম্নরূপ-

আসাদ বিন যুরারা, উসায়েদ বিন আল খুযায়ের, আবুল হায়শামা মালিক বিন তাইয়ান, সাআদ বিন উবাদা, বারাআ ইবনে মারূর, আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা, উবাদা বিন সামেত, সাআদ বিন রাবি, রাফে বিন মালিক, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর এবং সাআদ বিন খায়সামা। (যাঁর স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, সেই সাআদ বিন খায়সামাও সেই সমস্ত তত্ত্বাবধায়কদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এবং মুনযির বিন আমর।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত, সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২২৭-২৩২)

মদিনা হিজরতের সময় আঁ হযরত (সা.) কুবায় হযরত কুলসুম ইবনে আল হিদম (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। এ প্রসঙ্গে একথারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, আঁ হযরত (সা.) হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেন। এও বলা হয়ে থাকে যে, আঁ হযরত (সা.) হযরত কুলসুম ইবনে আল হিদম (রা.)-এর গৃহেই অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি (সা.) যখন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে যেখানে মানুষের মাঝে বসেন, সেটি ছিল হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর ঘর।

(আস সীরাতুন নাবুয়াত লি ইবনে কাসীর, পৃ: ২১৫-২১৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৫)

উকবার প্রথম বয়আতের পর আঁ হযরত (সা.) যখন হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-কে মদিনায় মুসলমানদের তরবীয়তের জন্য প্রেরণ করেন, তার কিছু সময় পর তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট জুমার নামাযের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর আঁ হযরত (সা.) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন এবং জুমার জন্য জরুরী নির্দেশনা দান করেন। এই নির্দেশনামা অনুসারে হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর গৃহে মদিনার প্রথম জুমআ অনুষ্ঠিত হয়।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৮৭-৮৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

কুবায় হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর একটি কুয়ো ছিল, যাকে বলা হত 'আল গারস'। আঁ হযরত (সা.) তা থেকে পানি পান করতেন। আঁ হযরত (সা.) সেই কুয়ো সম্পর্কে বলেন, এটি জান্নাতের প্রস্রবণগুলির একটি আর এর পানি উৎকৃষ্টমানের। অর্থাৎ এর পানি ছিল অত্যন্ত সুমিষ্ট, শীতল ও সুপেয়। আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁকে এই কুয়ার পানি দিয়েই গোসল দেওয়া হয়েছিল। হযরত আলি (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার মৃত্যু হলে 'গারস' কুয়ো থেকে সাত 'মশক' (চামড়ার থলে) পানি আনিয়ে তা দিয়ে আমাকে গোসল দিও। আবু জাফর মুহাম্মদ বিন আলি বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা.)-কে তিনবার গোসল দেওয়া হয়েছিল। 'কামিস' (জামা) পরিহিত অবস্থায় পানি ও কুলের পাতা দিয়ে গোসল দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পরনের পোশাক খোলা হয় নি। হযরত আলি (রা.), হযরত আব্বাস (রা.) এবং হযরত ফযল (রা.) মহানবী (সা.) কে গোসল দিয়েছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উসামা বিন যায়েদ, হযরত সুকরান (রা.) এবং হযরত অউস বিন খওলী (রা.)ও আঁ হযরত (সা.) -এর গোসল পর্বে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০) (সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস: ১৪৬৮) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৩)

কুরায়েশের নির্যাতন ও উৎপীড়নে অতিষ্ট হয়ে হিজরতকারী মুসলমানদের অনেকেরই প্রথম গন্তব্যস্থল হয়ে উঠেছিল হযরত সাআদ বিন খায়সামার এই গৃহটি। হিজরত করে যারাই আসতেন তারা হযরত খায়সামা (রা.)–এই গৃহে অবস্থান করতেন। তাদের মধ্য কতকের যে নামগুলি পাওয়া যায় তারা হলেন, হযরত হামযা (রা.), হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.), রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সেবক হযরত আবু কাবশা (রা.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) ও প্রমূখ। হিজরত করার পর তাঁরা হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করেছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ:৬,৩২,৩৬,১১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

সুলেমান বিন আব্বান বর্ণনা করেন যে, হযরত রসুল করীম (সা.) যখন বদরের উদ্দেশ্যে বের হন, তখন হযরত সাআদ বিন খায়সামা এবং তাঁর পিতা উভয়ে তাঁর সঙ্গে যেতে মনঃস্থির করেন। নবী করীম (সা.)-এর সমীপে একথা উপস্থাপন করা হল যে, এই পিতা-পুত্র উভয়ে বের হচ্ছে। একথা শুনে তিনি বলেন, তাদের মধ্যে কেবল একজন যেতে পারে। তারা যেন দুজনে ভাগ্য নির্ধারণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করে নেয়। হযরত খায়সামা বললেন, আমাদের মধ্যে যে কোনও একজন যেতে পারে। তুমি মহিলাদের তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষক হিসেবে তাদের কাছে থেকে যাও। হযরত সাআদ (রা.) বললেন, জান্নাত ছাড়া যদি ভিন্ন কোন বিষয় হত, তবে আমি অবশ্যই আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম, কিন্তু আমি নিজেই শাহাদাতের বাসনা রাখি। ফলে তারা দুজনে ভাগ্য নির্ধারণ করলে হযরত সাআদ (রা.)–এর নাম উঠে আসে। তিনি (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে বদরের উদ্দেশ্যে বের হন এবং যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আল মুসতাদরিক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৯, হাদীস- ৪৮৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

তাঁকে শহীদ করেছিল আমর বিন আবদে উদ। অপর এক উক্তি অনুসারে তুয়াইমা বিন আদি তাঁকে শহীদ করেছিল। তুয়ামকে হযরত হামযা (রা.) বদরের যুদ্ধে এবং আমর বিন আবদে উদ-কে হযরত আলি (রা.) খন্দকের যুদ্ধে হত্যা করেন।

(উসদুল গাবা, ২য় খণ্ড,পৃ: ৪২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত আলি (রা.) বলেন, বদরের দিন যখন সূর্য্য মধ্য গগনে ছিল আর মুসলমান (অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে) ও কাফেরদের সারি পরস্পর মিলিত হল অর্থাৎ যুদ্ধ বেধে গেল, তখন আমি এক ব্যক্তির পিছু ধাওয়া করতে বের হয়ে দেখি একটি বালির স্তপের উপর হযরত সাআদ বিন খায়সামা এক মুশরিকের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। পরিশেষে সেই মুশরিক হযরত সাআদ বিন খায়সামা (রা.) কে শহীদ করে দেয়। লৌহবর্ম পরিহিত সেই মুশরিক এক অশ্বারোহী ছিল। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল। আমাকে সে চিনে ফেলেছিল। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারি নি। এরপর সে আমাকে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করলে আমি তার দিকে অগ্রসর হই। অগ্রসর হয়ে সে যখন আমার উপর আক্রমণ করতে লাগল, তখন আমি নীচের দিকে নেমে পিছিয়ে আসি, যাতে উঁচু থেকে সে আমার কাছে চলে আসে, বেশি উঁচু যেন না হয়। যুদ্ধের রীতি হল নীচে আসা এবং কাছিয়ে আসা। কেননা, উঁচু স্থান থেকে আমার উপর সে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করুক, এমনটি আমি চাই নি। যখন আমি এভাবে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম, সে বলে উঠল, হে আবু তালেবের পুত্র! পালিয়ে যাচ্ছ কেন? আমি তাকে উত্তর দিলাম-

'কারিবুন মাফররু ইবনেশ শাতর' । অর্থাৎ শাতর'-এর পুত্রের পালিয়ে যাওয়ার সময়ে হয়েছে। অর্থাৎ অসম্ভব। আরবে এটি একটি প্রবাদবাক্যের রূপ নিয়েছিল। কেননা, কথিত আছে যে, এক দস্যু মানুষের ধন-সম্পদ লুটপাট করতে আসত। লোকেরা তার উপর আক্রমণ করলে সে পালিয়ে যেত, কিন্তু তার পলায়ন ক্ষণিকের জন্যই হত। সুযোগ পেলে সে পুনরায় এসে আক্রমণ করত। তাই এটি একটি উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ কৌশলের জন্য পিছিয়ে এসে পুনরায় আক্রমণ কর। হযরত আলি (রা.) বলেন, যখন আমার পা দুটি শক্ত মাটি খুঁজে পায় আর সেও আমার কাছে চলে আসে, তখন সে তরবারি দিয়ে আমার উপর আক্রমণ করে যা আমি বর্মের দ্বারা প্রতিহত করি এবং তার কাঁধের উপর সজোরে তরবারি দিয়ে আঘাত করি যার ফলে আমার তরবারি তার লৌহবর্মকে ভেদ করে বেরিয়ে আসে। আমার বিশ্বাস ছিল, আমার তরবারি তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। এমন সময় বুঝতে পারি যে, আমার পিছনে তার তরবারি ঝলসে উঠছে। অর্থাৎ বলা হচ্ছে দ্বিতীয় বার আঘাত করার পূর্বে তিনি নিজের পিছনে কোন তরবারির ঝলকানি অনুভব করলেন। আমি অনতিবিলম্বে নিজের মাথা নামিয়ে আনি, কেননা পিছন থেকে তরবারি চালিত হচ্ছিল। সেই তরবারি এমন প্রবল বেগে সেই শত্রুর উপর আঘাত হানে যে, তার দেহ থেকে মস্তক ছিন্ন হয়ে পড়ে। হযরত আলি (রা.) বলেন- আমি পিছনে ফিরে দেখি, তিনি ছিলেন হযরত হামযা (রা.) তিনি তাকে বলছিলেন, আমার আঘাত সামলাও, কেননা, আমি হলাম আব্দুল মুতালেবের পুত্র।

(কিতাবুল মাগাযী লিল ওয়াকদি, পৃ: ৯২-৯৩) (লুগাতুল হাদীস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩১, আলি আসিফ প্রিন্টার কর্তৃক লাহো থেকে প্রকাশিত)

এই যে বলা হচ্ছে অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল, এই রেওয়ায়েত থেকে বোঝা যায় যে, তুয়াইমা বিন আদি হযরত সাআদ (রা.) কে শহীদ করেছিল এবং সে সেখানেই নিহত হয়েছিল। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে বদরের যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.) -এর সঙ্গে দুটি ঘোড়া ছিল। একটি ঘোড়ার উপর হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.) এবং অপরটির উপর হযরত সাআদ বিন খায়সামা আরোহিত ছিলেন। হযরত যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) এবং মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) -এরাও পালা করে এই ঘোড়া দুটির উপর সওয়ার হয়েছিলেন।

(দালায়েলুন নাবুয়ত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৮৮)

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে কতগুলি ঘোড়া ছিল? এ সম্পর্কে ইতিহাসে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব (রা.)-এর মতে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কাছে সত্তরটি উট এবং দুটি ঘোড়া ছিল।

শেষাংশ ১০ পাতায়.....

যুগ খলীফার বাণী

হযরত আলি আলি কারামুল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন: ধৈর্য ও নিষ্ঠাপূর্ণ দোয়া যখন চরমে যখন পৌঁছে যায়, খোদার দরবারে সেই দোয়া গৃহীত হয়। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া, মুর্শিদাবাদ

যুগ ইমামের বাণী

যে ব্যক্তির মনে ইসলামের জন্য সম্মান ও আত্মাভিমানের চেতনা নেই, খোদা তা'লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১)

দোয়াপ্রার্থী:

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

এরপর ৮ এর পাতায়..

আসে, তবে সেটি তাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাদের মধ্যে পুণ্যত্মা ও সাধুপ্রকৃতির মানুষেরা এদিকে এসেছেন। তাদের মধ্যে কিছু আমার সামনে বসে আছেন। তিনি (আ.) কখনওই একথা বলেন নি যে, মানুষ অনতিবিলম্বেই গ্রহণ করবে।

তিনি বলেছেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর পর তিন শতাব্দী পর বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। আমি মহম্মদী মসীহ॥ আমার পর এই সময়ের পূর্বেই বিজয়ের লক্ষণ প্রকাশ পাবে। তিনশ বছর অপেক্ষা করতে হবে না।

সামাহ সাহেবা বলেন, আমার ছেলে জ্বালাতন করে, পড়াশোনা করে না, সে ওয়াকফে নও। তার জন্য দোয়া করুন। হুযুর আনোয়ার বলেন, ওর প্রতি কঠোর হবেন না। নিজেই ঠিক হয়ে যাবে।

জার্মানীতে বসবাসকারী আলবেনিয়ান অতিথিরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত। করেন অতিথিদের সংখ্যা ছিল ৬০ জন।

এক ভদ্রলোক হুযুরের সঙ্গে সক্ষাতের সময় বলেন, আল্লাহ্‌র বিশেষ কৃপায় আজ আমরা হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করছি। আমরা নারী-পুরুষ সকলে হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

এক তবলীগাধীন ইমাম ডক্টর হুদ হাজী জামীনীলায়ে সাহেব নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমি জলসা সালানার ব্যবস্থাপনা দেখে অভিভূত হয়েছি। এখানে এসে আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার বাস্তব নমুনা প্রত্যক্ষ করেছি। নতুন বছর উপলক্ষ্যে জার্মানের আহমদী সদস্যসের পক্ষ থেকে সাফাই অভিযানের আয়োজন আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমার দোয়া এই যে, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সফল করুন এবং সার্বিকভাবে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

এক ভদ্রলোক বলেন, আমি প্রথমবার জামাতের কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছি। টিভি ও মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা জামাত আহমদীয়ার জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে জানতে পারি। এই জলসার ব্যবস্থাপনা দেখে আমি যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হন।

আরেক ভদ্রলোক বলেন, আমি জার্মানীতে থাকি আর কোসোভো শহরে প্রায়শ যাতায়ত করি। ১৯৯৪ সাল থেকে এখানে আছি। আমি যখনই কোসোভা যাই, সেখানে আমি নিজের আত্মীয় স্বজনদেরকে তবলীগ করি এবং তাদেরকে আহমদীয়াতে বাণী পৌঁছে দিই। সেখানে আমাদের বিরোধীরাও রয়েছে। দোয়া করুন যে, খোদা তা'লা আমাকে সঠিক বাণী পৌঁছে দেওয়ার তৌফিক দেন এবং আর আমার আত্মীয়-স্বজনেরাও যেন আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়।

এক ভদ্রলোক বলেন, আমি কোসোভা থেকে এসেছি। আর এখানে জার্মানীতেই থাকি। খোদা তা'লা আমাকে প্রথম বার হুযুর আনোয়ারকে এত কাছে থেকে দেখার সুযোগ দিচ্ছেন। আমি অনেক সৌভাগ্য যে কারণে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম।

আওনা কাম্বেরী নামে এক ভদ্রলোক বলেন: আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে তাঁর খলীফার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সাক্ষাতের সুযোগ দিলেন। হুযুর আনোয়ারের সত্তা থেকে কেবল ভালবাসার বিচ্ছুরণ ঘটছিল, যা জলসা সালনার দিনগুলিতে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাচ্ছিল। হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ঘটনাটি আমার স্মৃতিপটে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে, কেননা, এর পূর্বে আমি তাঁকে স্বপ্নেও দেখি নি।

তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক আলজেরিয়ান বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তাঁর সঙ্গে আমার বিগত ২০ বছর থেকে পরিচয়। আমি যখন তাকে বললাম যে, আমি এই দুই হাত দিয়ে প্রিয় ইমামের সঙ্গে করমর্দন করেছি, তখন সেও আমার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে সেই বরকতের অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। আমার চোখে অশ্রু নেমে আসে। বস্তত খলীফাতুল মসীহর কল্যাণেই এই ভালবাসা আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছে। এরপর পাকিস্তানের এক আহমদী ভাইও এই কারণে আমার সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হন। এরফলে আল্লাহ্‌র জামাতের প্রতি ভালবাসায় আমার হৃদয় আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। আমি এই দোয়া করি যে, প্রিয় হুযুরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হওয়ার এই বরকত যেন আমার সত্তার মধ্য দিয়ে জামাতের স্বার্থে প্রকাশিত হয়। আমি হুযুরকে রসুলে করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে সালামের বাণী পৌঁছে দিতে পেরে যারপরনায় আনন্দিত। সেই সময় আমার মনে হচ্ছিল যেন, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) স্বয়ং আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন।

ইমামের বাণী

জাতি হিসেবে অস্তিত্ব লাভের জন্য একাত্মতা এবং আনুগত্য প্রদর্শন অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৫ই ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

মাননীয় ইলির চুলিয়ানজি সাহেব একজন পুরোনো আহমদী। তিনি প্রথমবার হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছেন। তিনি নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি ভাষায় বর্ণনা করার শক্তি আমার নেই। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, খিলাফতের মাধ্যমে প্রাপ্ত এই আধ্যাত্মিক খাদ্য-সম্ভার দ্বারা আমরা কেবল আহমদীরাই নয়, বরং অন্যান্য মুসলমানেরাও কল্যাণমণ্ডিত হবে যাদের এই খাদ্যসম্ভারের ভীষণ প্রয়োজন।

এক ভদ্রলোক বলেন: আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, খানা কাবা হজ্জ করছি। লক্ষ্য করি খানা কাবার পর্দা অপসারিত হয়েছে। আর খানা কাবার অভ্যন্তরভাগটি একটি রেস্টুরেন্ট সদৃশ মনে হচ্ছে। খানা কাবার পাশে দুতল বিশিষ্ট আরেকটি ভবন আছে, যেখানে আমি এক আহমদী সদস্যের সঙ্গে নামায পড়লাম। স্বপ্নটি শোনার পর হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি খানা কাবাকে যে রেস্টুরেন্ট সদৃশ দেখেছেন, এর অর্থ হল মানুষ আজ কাল সেখানে জাগতিক স্বার্থে যেতে আরম্ভ করেছে আর একে জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খোদা করুক, সেই সময় যেন শীঘ্র আসে যখন আহমদীরা সেখানে যাওয়া আরম্ভ করবে যাতে খানা কাবার প্রকৃত উদ্দেশ্য বহাল থাকে এবং নিজের প্রকৃত আধ্যাত্মিক মর্যাদা ফিরে পায়। খোদা তা'লাই জানেন সেই সময় কখন আসবে।

হুযুর আনোয়ার এই প্রসঙ্গে 'তাযকেরাতুল আওলিয়া' পুস্তকে লিপিবদ্ধ আব্দুল্লহ্ বিন মুবারক (রহ.)-এর একটি রুইয়্যার উল্লেখ করে বলেন, স্বপ্নে ফিরিশতা একথা বলেছে যে, এবছর এক ব্যক্তি ছাড়া কারো হজ্জ গৃহীত হয় নি। কিন্তু তার হজ্জ গৃহীত হয়েছে, যে কি না হজ্জে আসে নি।

এক যুবক সম্পর্কে বলা হয় যে, এই ছেলেটি তার পিতা-মাতার বিবাহের সাত বছর পর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর দোয়ার কল্যাণে জন্ম লাভ করেছিল। হুযুর (রহ.) তাকে হোমিওপ্যাথিক ব্যবস্থাপত্রও প্রেরণ করেছিলেন। ছেলেটির বাসনা, হুযুরের সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ হবে। হুযুর আনোয়ার (আই.) স্নেহভরে তার সঙ্গে আলিঙ্গন করেন। সেই যুবক হুযুরের সঙ্গে ছবিও তোলে।

****

১ম পাতার পর..

শক্তিগুলিই শয়তান যা মানুষের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। যদি এগুলির সংশোধন না হয়, তবে তা মানুষকে নিজ দাসে পরিণত করে। এমনকি জ্ঞান-বুদ্ধিই অপপ্রয়োগের মাধ্যমেই শয়তানে পরিণত হয়। মুত্তাকির কাজ হল এটিকে এবং অন্যান্য সকল শক্তিবৃত্তিকে পুণ্যার্থে এবং যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

সত্য ধর্ম মানবীয় শক্তিসমূহকে মরিমার্জিত করে। এই কারণে যে সমস্ত মানুষ প্রতিশোধ, ক্রোধ অথবা বিবাহকে সকল ক্ষেত্রেই অপছন্দের দৃষ্টিতে দেখে, বস্তত তারাও প্রকৃতির বিরুদ্ধে। আর তারা মানবীয় শক্তি সমূহকে দমন করতে চায়। সেটিই সত্য ধর্ম যেটি মানবীয় শক্তিসমূহকে নিমূল করে না, বরং সেগুলির পরিচর্যা করে। পৌরুষ ধর্ম বা ক্রোধশক্তি যা পুরুষদের চরিত্রের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে, কেউ সন্যাসী বা সংসার-ত্যাগী হয়ে যদি সেগুলিকে পরিহার করে, তবে তা খোদার সঙ্গে যুদ্ধ করার নামান্তর। এগুলি মানুষের অধিকার হরণ করার সমান। মানবীয় শক্তিবৃত্তিকে যদি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা হয়, তবে তা সেই খোদার উপর আপত্তি উত্থাপন করার সামিল যিনি, এই শক্তিসমূহ আমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতএব যেরূপ শিক্ষা ইঞ্জিলে রয়েছে, যার ফলে শক্তিসমূহকে পরিহার করা অনিবার্য হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে এই শিক্ষা মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে চালিত করে। আল্লাহ্ তা'লা তো এটির পরিচর্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি সেটিকে নষ্ট করে ফেলা পছন্দ করেন না। যেরূপ তিনি বলেছেন- اِنَّ اللّٰہَ یَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَ الۡاِحۡسَانِ (আন নাহল: ৯১) ন্যায় বা ভারসাম্য এমন এক বিষয় যেটিকে সকলের কাজে লাগানো উচিত। হযরত মসীহ (আ.)-এর শিক্ষা যে 'যদি তোমার প্রতি কেউ কুদৃষ্টি দেয় তবে, সেই চোখ উপড়ে ফেল' এমন শিক্ষাতেও মানুষের কর্মক্ষমতাকে নিমূল করা হয়েছে। কেননা, এমন শিক্ষা দেওয়া হয় নি, তুমি 'গায়ের মুহাররম' মহিলার দিকে মোটেই দৃষ্টি দিবে না। বরং এর বিপরীতে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে যে, অবশ্যই দেখ, কিন্তু কামলোলুপ দৃষ্টি দিয়ে দেখবে না। দেখার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞাই নেই। .... কুরআন করীমের মত চোখকে এমন বিষয় দেখা থেকে কেনই বা বাধা দেওয়া হল না, আর কেনই বা চোখের মত অমূল্য বস্তকে নষ্ট করাকে দুঃখ জনক বলা হল না?

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯-২১) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

যুগ ইমামের বাণী

কোন জাতি ততদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে, যতদিন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ থাকে।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯২)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

"সাহেবযাদী আমতুল হাফিয বেগম সাহেবার জীবনী"

মূল : মোহ্তরমা তৈয়্যেবা রাজ্জাক সাহেবাসদর লাজনা হায়দ্রাবাদ,

অনুবাদ: সৈয়্যদ যাফরুল্লাহ্ , মুবাল্লিগ সিলসিলা

(পূর্ববর্তী সংখ্যা ১১-এর পর)

ধৈর্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন তার বৈশিষ্ট্য ছিল। আল্লাহ্ তাকে ভালোবাসতেন এবং তিনি আল্লাহর ভালোবাসায় মগ্ন থাকতেন। আমার উপরে আল্লাহতা'লা যে সমস্ত অনুগ্রহ বা কৃপা করেছেন তা সবই তার কারণে। হজরত বাণী সিলসিলা চার বছর বয়সে তাকে তার খোদার অভিভাভক দিয়েছিলেন। যখন থেকে তিনি তার মওলার নিকট খুবই ভালাবাসার সাথে থাকতেন এবং আমার শান্তির কারণ হয়েছেন তা আমার জন্য ঔষধের কাজ দিত। তিনি আল্লাহর হাফিজ গুণের প্রকাশ ভাণ্ডার।

(মাসিক মিসবাহ্ রাবওয়া, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮)

সারসংক্ষেপ হল এই যে, উদাহরণ দেওয়ার মত এই দম্পতি ছিল তারা। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলতেন যে, এই রকম ভালোবাসা ও নিষ্ঠা দুনিয়াতে কম দেখা যায়। হজরত নবাব সাহেবের জীবন খুবই সহজ সরল ছিল আর হজরত সৈয়্যেদা আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবা খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। আমাদের মধ্যে এই ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও হজরত নবাব সাহেবের ভালোবাসাকে গুরুত্বের নজরে দেখতেন এই ব্যবধানকে ভালোবাসার চাদরে ঢেকে দিতেন। এই বিষয়গুলির মধ্য দিয়ে তার উত্তম চরিত্র প্রকাশ পেত। তবেই তো আল্লাহতা'লা তাকে "দুঃখতে কারামনা" এর মত উপাধি দিয়েছেন।

যখন তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেন তখন তার তিনটি সন্তান অবিবাহিত ছিল। এই কঠিন সময়েও তিন সাহস হারান নি। নিজের সন্তানদের এবং নিজেকে মজবুত করেছেন। তিনি পুরুষদের মত সমস্ত কাজ সামলেছিলেন।

তিনি খুবই দোয়াকারী ছিলেন। ঘন্টার পর ঘন্টা তিনি নফল নামাজ আদায় করতেন এবং নিজের সন্তানদের দোয়ার উপদেশ দিতেন। জামাতের মেয়েরাও তার কাছে দোয়ার আবেদন করতে আসতেন। এবং তিনি তাদের জন্য দোয়াও করতেন এবং যতক্ষণ দোয়া কবুল না হত তাদের জন্য চিন্তিত থাকতেন। বেশিরভাগ সময় এমন হত যখনই তার কোন জিনিষের প্রয়োজন পড়ত আল্লাহতা'লা কোথাও না কোথাও থেকে পাঠিয়ে দিতেন। তখনই তার চেহারায় একটা খুশির প্রকাশ পেত। তিনি বারবার আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন। লোকেদেরকেও খুশির সঙ্গে তা বর্ণনা করতেন।

হজরত সৈয়্যেদা আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবার মধ্যে অসাধারণ ধৈর্য ছিল। তার যুবক জামাই সাহেবজাদা মির্যা সামিম আহমেদ সাহেব টোকিও তে হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তার মেয়ে সাহেবজাদী ফৌজিয়া সাহেবা তিনটি ছোট ছোট মেয়েকে নিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন। তখনও তিনি ধৈর্য ও সাহসের সাথে সামলান। যতদিন জীবিত ছিলেন খুবই ভালোবাসা এবং ধৈর্যের সঙ্গে তাদের জন্য দোয়া করতেন এবং আশ্রয় দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

হজরত সৈয়্যেদা সাহেবার মধ্যে খিলাফতের প্রতি সীমাহীন শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল হজরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (রহঃ) তার ভাইপো ছিলেন এবং তার থেকে ছোট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর খলিফা হওয়ার পর তাঁকে মিঞা নাসের বলতেন। হজরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) কে তিনি খুবই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। যখন হজরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) খলিফা হলেন সেই আংটি যা হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বানিয়েছিলেন তাকে পরানো হয়, তিনি বলেন আজ হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ছোট মেয়ের হাত দিয়ে পরবো। সুতরাং তিনি এই আংটিটি পরিয়ে দেন। এটি কতই না অবিশ্বাস্য দৃশ্য ছিল। সেই ফুফু যে তার থেকে ছোট ভাইপোর সঙ্গে নির্দিধায় মিলতেন সেই সময় তিনি মাথায় দোপাট্টা নিয়ে বসেছিলেন। এবং হুজুরকে খুবই ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে আংটি পরাচ্ছিলেন। সেই দিনের পর থেকে তার সেই "তারী" সব সময়ের জন্য মিঞা তাহের হয়ে যায়। হজরত খলিফাতুল মসীহ রাবের হিজরতের বিরহ তাকে খুব দুঃখিত করেছিল। তিনি তাকে প্রায়শই মনে করতেন এবং যাত্রীদের বলে পাঠাতেন যে, আমার নামাজে জানাযা গায়েব যেন না পড়ানো হয় কিন্তু আল্লাহ অন্য কিছু রেখেছিলেন। হুজুর তার মৃত্যুর পর একটা খোতবাতে বলেন যে, "সৈয়্যেদা আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবাকে আমি খুবই ভালোবাসি এবং তাকে আমি আমার মাতৃতুল্য জ্ঞান করি।"

হজরত সৈয়্যেদা সাহেবার ঘরের লোকদের কাছ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে তিনি কত উচ্চ পদমর্যাদাসীন ছিলেন। সুতরাং হজরত সৈয়্যেদা মরিয়ম সিদ্দীকা যিনি তার ভাবি ছিলেন বলেন যে,

"আল্লাহতা'লা তাকে আর একটা বড় সৌভাগ্য প্রদান করেছেন যে, পাকিস্তানের বাইরে সুইজারল্যান্ডের মসজিদ (বাইতুয্যিক্র)-এর ভিত্তি স্থাপন তার পবিত্র হাত দ্বারা রেখেছিলেন। তিনি ২৪ আগষ্ট ১৯৬২ সালে ইউরোপেও মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী!

তার ঘরের লোকেদের মধ্য থেকে আর একটি মহান ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ সৈয়্যেদা মেহের আপার সাক্ষী রয়েছে এই মহান ব্যক্তিত্বটি হজরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং তার বড় ভাবি। তার বর্ণনাকৃত জীবনীর ঘটনাগুলির মধ্যে একটি ঘটনা এখানে শোনাতে চাই যার মধ্য দিয়ে একদিকে তার উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারি অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার উপর চলার প্রতি তার আগ্রহ প্রকাশ পায়। সুতরাং হযরত মেহের আপি বর্ণনা করেন যে,

"সৈয়্যেদনা হজরত ফযলে উমরের মৃত্যুর পর যখন আমার ইদ্দতের দিন শেষ হয়ে যায় তার একদিন পূর্বে সকাল সকাল আমার বাড়িতে আসেন। তখন আমি ড্রেসিং রুমে ছিলাম। তিনি আমাকে রুমে না পেয়ে একটা সুগন্ধির বোতল আমার ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে দেন এবং আমার কাজের মেয়েকে এই বার্তা দিয়ে দ্রুত চলে গেলেন যে, মেহের আপাকে বলবে যে আজকে তোমার ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে। স্নান করো কাপড় পাল্টাও এই সেন্ট যা আমি তোমার জন্য এনেছি তা লাগাও এবং আজকে থেকে আমি তোমাকে ভালো কাপড়ে দেখতে চাই। এরকমভাবে পরবে, গায়ে দিবে। যতটা দূর খোদাতা'লার নির্দেশ সীমা ছিল তা আজকের দিনে পুরণ হয়ে গেল।

(মাসিক মিসবাহ্ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮)

সত্যতা এই যে, যারা নিজেকে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তারাই উচ্চ মার্গ পায়। আল্লাহতা'লা এই রকম লোকেদের সর্বদা বাড়াতে থাকে।

স্বামীর সাক্ষ্য ঘরের লোকেদের সাক্ষ্য এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্যের অবশ্যই কোন গুরুত্ব হয়ত নাই। তাহলে তো এগুলোর উপর প্রাধান্য এবং সুসংবাদ বাহক যা খোদাতা'লা তার জন্মের পূর্বেই দিয়েছিলেন এবং সুসংবাদের দ্বারা জন্মলাভ করা সন্তানের পদমর্যাদা সম্পর্কে হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহহতা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন اِنِّیْ مَعَكَ وَمَعَ اَهْلِكَ (তাযকিরা পৃষ্ঠা : ৪৩১) অর্থাৎ আমি তোমার সাথে এবং তোমার পরিবার পরিজনদের সাথে আছি।

হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর মত তিনিও তার সন্তানদের উপর কখনও জবর করেনি। তিনি তার সন্তানদের অযথা পয়সা দেওয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি অনুভব করতেন যে, এর দ্বারা বাচ্চাদের মধ্যে অতি ব্যয়ের অভ্যাস সৃষ্টি হয়। যখনই কোন প্রয়োজনে পয়সা দিতেন, তার পুরা হিসাব নিতেন। এটা এই জন্য যে বাচ্চাদের মধ্যে লেনদেনের ব্যাপারে সততা বজায় থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে, মায়েরা তাদের বাচ্চাদের জন্য বার্ষিকীতে কেক নিয়ে এসে দাওয়াত করে এবং বিভিন্ন উপহার দেন। তিনি কখনই এই রকম করেন নি। তিনি ঐদিনে কোন না কোন সৎ উপদেশ দিতেন এবং বলতেন যে, খোদা ব্যতিত অন্য কারোর কাছে কোন আশা রাখা উচিৎ নয়। এবং খোদা সৃষ্ট জীবের প্রতি সহানুভূতিকে নিজের কর্ম বানানো উচিত। কোন ব্যক্তিকে কথা বা হাত দ্বারা দুঃখ দেওয়া উচিত নয়।

শ্রোতামণ্ডলী!

এর থেকে উত্তম উপহার কোন মা কি তার বাচ্চাদের দিতে পারে ? এত সুন্দর উপদেশ যদি আমরা মেনে নিই তাহলে খোদাও খুশি হবেন আর বান্দাও খুশি হবে। যদি আমরা আমাদের বার্ষিকীতে এই সমস্ত সুন্দর কথাগুলি উপর আমল করার শপথ গ্রহণ করি তাহলে এটি প্রকৃতপক্ষে বার্ষিকী হবে।

তিনি সর্বদা নিজের সন্তানদের বোঝাতেন যে, মেয়েদের বন্ধুত্বের মধ্যে

যুগ ইমামের বাণী

"খোদাকে ভয় কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং কোন সৃষ্টির উপাসনা করো না। " (রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১২)

দোয়াপ্রার্থী: শামসের আলি, জেলা আমীর, বীরভূম

কোন গোপনীয়তা রাখা উচিত নয়। তিনি তার মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার করতেন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবধান থাকত। এমনকি নিজের প্রভাবও তাদের উপরে বিস্তার করতেন। তিনি তার বাচ্চাদের আত্মমর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখতেন এমনই মা ছিলেন।

মহতরমা সাহেবযাদী ফৌজিয়া বেগম সাহেবা বলেন যে, আমার মা খুবই ইবাদতকারী ও দোয়াকারী এবং আল্লাহ্ ও রসুল (সাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসাকারী বিশ্বস্তকারী ও দৃঢ় সংকল্পকারী খুবই হিম্মতওয়ালী ও স্বামীর আনুগত্যকারী নিষ্ঠাবতী ও খিদমতকারী এবং অত্যধিক ধৈর্য ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনকারী মহিলা ছিলেন। তিনি নম্র প্রকৃতির ছিলেন। এবং লোক দেখানো তার মধ্যে নাম মাত্র ছিল না।

(মাসিক মিসবাহ্ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, পৃষ্ঠা : ৬০)

পুনরায় বলেন যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ছিল। একবার আমি বলে দিই যে, আজকালকার লোকেরা রসূলুল্লাহর প্রতি ভালোবাসার সীমাকে ও অতিক্রম করে দিয়েছে। এই শুনে তার চোখে জল এসে গেল এবং বললেন যে, এরকম কখনও বলো না। অনেক সময় রসূলুল্লাহর প্রতি খোদার সমকক্ষ বলে মনে হয়। ঐ দিন আমি জানতে পারি যে, আঁ হজরত (সাঃ) -এর ভালবাসায় উনি কিরূপ বিভোর ছিলেন। খোদার সত্তাতে উনি সীমাহীন বিশ্বাস রাখতেন। দোয়ার প্রতিও সীমাহীন বিশ্বাস রাখতেন সুস্থ অবস্থাতেও ঘন্টার পর ঘন্টা ইবাদতে অতিবাহিত করতেন।

(মাসিক মিসবাহ্ পৃষ্ঠা : ৬৪ ও ৬৫)

শ্রদ্ধেয় শ্রোতামণ্ডলী!

এই সংক্ষিপ্ত অল্প সময়ের মধ্যে শুধুমাত্র কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথার উদ্ধৃতি তুলে ধরতে পারি এবং এবার আমি আপনাদের সামনে তার কিছু পংক্তি মালার মধ্য থেকে অল্প মুক্তো আপনাদের সামনে রাখতে চাই। যার দ্বারা তার নম্রতার বহিঃপ্রকাশ হয়। অন্যদিকে পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনাও জানতে পারি। মহতরমা আমতুল হাদী সাহেবা করাচী তিনি লেখেন যে, আমাদের আবেদনের পর তিনি যে বার্তা আমাদের তনজিম লাজনা ইমাউল্লাহ্ করাচীকে দিয়েছেন তা আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর। যা এরকম ছিল যে-

"আসসালামো আলাইকুম। আমি আমার সমস্ত বোনদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যারা আমার জন্য বার বার কষ্ট করে আমাকে ডেকে পাঠান। করাচি জামাত যে ভালোবাসা এবং নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ করছে আমি তার জন্য শুধুমাত্র এটাই বলতে পারি আল্লাহতা'লা তাদেরকে ফল প্রদান করুন। আল্লাহর নিকট যথা সময়ে আমি সমস্ত বোনেদের এবং ভাইদের জন্য দোয়া করি এবং আল্লাহর ফযলে আমি দোয়ার সুযোগ পেতে থাকি এবং আমার বোনেদের কাছে আবেদন করব যে, তারাও যেন আমার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করে যে, আল্লাহতা'লা আমাকে যে পদমর্যাদা দিয়েছেন আমি যেন তার প্রকৃত উত্তরসূরী হতে পারি। কেননা আমি তার যোগ্য মনে করি না যে, আমি হজরত বাণী সিলসিলা আহমদীয়ার সাথে যুক্ত কিন্তু এটা একটি সম্মান যা আল্লাহতা'লা বিনা চাওয়ায় আমাকে দিয়েছেন। খোদা করুক আমিও যেন নিজেকে সেইরূপ যোগ্য মনে করতে পারি।" (মিসবাহ্ পৃষ্ঠা : ৪৩)

এই সমস্ত বুজুর্গ এবং বরকতময় ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে হজরত মুহলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেন যে,

"খোদার নবীর সাথে সম্পর্কযুক্ত তার স্ত্রীরা তার সন্তানরা তার মেয়েরা তার বন্ধু-বান্ধব তার আত্মীয়-স্বজন সবাই তার বরকত থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে গেছে যা তার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা এটা খোদাতা'লার সুন্নত, কেননা এটা তার পদ্ধতি। যেরকম স্ত্রীরা বাচ্চারা বরকত থেকে অংশ নেয় ঠিক ওই রকম নিগূঢ় বন্ধুত্ব ও বরকত থেকে অংশ পায়। যা নবীর সঙ্গে তারা নিজেদেরকে জুড়ে দেয়। এই সমস্ত লোক খোদার তরফ থেকে অতি সুন্দর হয়। এবং দুনিয়া তাদের কারণে অনেক বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়।

(খোতবা জুম্মা ২২ আগষ্ট ১৯৪১)

শ্রোতামণ্ডলী!

আমরা এবং আকাশ বাতাস এর সাক্ষ্য দিই যে, হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে দোয়া তার সন্তানদের জন্যে করেছিলেন যে-

'আমার সন্তান যা তোমার দেওয়া
তাদের প্রত্যেকেই দেখে নাও কতই প্রিয়'

কত সুন্দর ভাবে পূরণ হয়েছে। তার সন্তানদের সাথে এই দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যাকে আল্লাহ্তা'লা নিজেই "দুঃখতে কারাম" নাম দিয়েছিলেন সত্য যে,

এই রকম মেয়ে যার উপর যুগের ইমাম গর্ব করে
যার আঁচলে ফেরেস্তারা সিজদায় লুটিয়ে দিত

তার একটি কবিতা পড়ে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করব। এবং দোয়া করব আল্লাহ্তা'লা প্রতিক্ষণ হজরত আমতুল হাফিজ বেগম সাহেবার পদমর্যাদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকুক এবং আমাদের সবাইকে তার উপদেশ সমূহের উপর চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

এই কবিতাটি তিনি তার স্বামীর মৃত্যুর পর বলেছিলেন।

میری جدائی گوارا ہوئی تمہیں کیونکر
تمہیں یہ ذکر بھی تھا نا گوار یاد کرو
تم اب کہاں ہو؟ کہاں ہے قرار دل کا میرے
بنے تھے تم میرے دل کا قرار یاد کرو
خدا کرے کبھی بے اختیار یاد آؤں
خدا کرے کبھی بے اختیار یاد کرو
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

****

খুতবার শেষাংশ.....

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত, 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৫৩)

কিন্তু অন্যান্য আরও পুস্তাকাদিতে ঘোড়ার সংখ্যা তিনটি এবং পাঁচটি বর্ণনা করা হয়েছে। (শারাহ যুরকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

(আসসীরাতুল হুলবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

যাইহোক সাজসরঞ্জাম, ঘোড়া ও উটের সংখ্যা যাই থাক না কেন, কাফেরদের সাজসরঞ্জাম ও ঘোড়ার সংখ্যার সঙ্গে কোন তুলনা হতে পারত না। কিন্তু যখন মুসলমানদের উপর আক্রমণ হল, যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হল আর কাফেরা ইসলামকে ধ্বংস করে দেওয়ার সংকল্প করল, তখন মোমেনীনদের এই দলটি নিজেদের সাজসরঞ্জাম বা ঘোড়ার সংখ্যা দিকে দৃষ্টি দেয় নি, বরং খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে এক ব্যগ্রতা ছিল। যেরূপ তাঁর উত্তর থেকেও স্পষ্ট যে, এখানে অন্য কোন জাগতিক বিষয়ের বাসনা করার প্রশ্ন ছিল না, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করা। এই কারণে পুত্র পিতাকে বলল, এখানে আমি তোমাকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। যাইহোক এই ব্যকুলতাই আল্লাহ তা'লা গ্রহণ করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন। আল্লাহ তা'লা এই সমস্ত সাহাবীদের পদমর্যাদা উন্নত করতে থাকুন।

****

আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান (আ.) বলেন-

" আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামাল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না, এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি-আমরা এর হিকমত বুঝি না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহর ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক' খণ্ড-১, পৃ: ৫)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যদিও তোমাদের দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয় আর ধন-সম্পদ লুট করে নেওয়া হয়, কিন্তু যদি তোমরা দেখ পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা বিদ্যমান আছেন, তবে তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাও। **(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, হাদীস: ২২৩৩৩)**

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও দুরদর্শিতা

মৌলানা সৈয়্যদ মোহাম্মদ আহমদ
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা মূলত যা বোঝায় তা হল, কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা অনুমান করা- যার ফলে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। পবিত্র কুরআন করীমে হযরত ইব্রাহিম (আ.), হযরত ইসহাক (আ.) এবং হযরত ইয়াকুব (আ.) কে বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন করীমের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্তা অগণিত ওহী-ইলহাম লাভের দরুন নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর কুরআন করীমের সূরা ইউসুফে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, 'তুমি বলে দাও যে এটা আমার পথ। আমি আল্লাহ্ তা'লার দিকে আহ্বান করি। আমি বিচক্ষণতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে-ও যে আমার অনুবর্তিতা করে।" অতএব, বিচক্ষণতা হল এক প্রকারের ঈমানী শক্তি।

হযরত রসুল করীম (সা.) বলেছেন, মুমিনের অন্তর্দৃষ্টি থেকে বেঁচে চল। কেননা, মুমিন খোদা তা'লার নুর দ্বারা দেখে থাকে।"

কুরআন হতে জানা যায়, যে ব্যক্তি খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণরূপে ঝুঁকে এবং দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে তার ঈমানী অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পায়।

আমরা দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) ফজরের নামাযের পূর্বে এই দোয়ার মাধ্যমে দিন শুরু করতেন যে, ' হে আল্লাহ্! আমার অন্তরকে আলোকিত কর, আমার ভাষাকে আলোকিত কর, আমার শ্রবণশক্তিকে আলোকিত কর, আমার দৃষ্টিশক্তিকে আলোকিত কর, আমার পিছনকে আলোকিত কর, আমার সম্মুখকে আলোকিত কর, আমার উপর আলোকিত কর এবং আমার নিচে আলোকিত কর। হে আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর।"

হযরত রসুলে করীম (সা.) -এর বিচক্ষণতার এই সাক্ষ্যও কুরআন দেয় যে, তিনি অভাবীকে তার চেহারা দেখেই চিনে ফেলতেন। একদা তিনি (সা.) মসজিদে নববীতে জুমআর খুতবা প্রদান করছিলেন; এমন সময় এক অভাবী ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে। তখন তিনি (সা) উপস্থিত সবাইকে সদকা প্রদানের আহ্বান জানান। সদকা দেওয়া হয়ে গেলে তিনি (সা.) সেই অভাবীকেও দুটি কাপড় দান করেন। সেই অভাবী ব্যক্তি তা থেকেও একটি কাপড় সদকা হিসেবে দিয়ে দেয়। তখন তিনি (সা.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, তোমার কাপড় ফিরিয়ে নাও। অর্থাৎ, তাকে বলতে হয় নি যে, সে অভাবী। বরং তিনি তাকে দেখেই বুঝে গিয়েছিলেন যে, এই ব্যক্তিটি অভাবে আছে।

কুরআন করীমে আঁ হযরত (সা.)-এর আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে,তিনি মুনাফিকদিরেকে তাদের আচরণ দ্বারাই চিনে ফেলবেন। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াকাস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) একদা সম্পদ বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তিকে তিনি কিছুই দান করেন নি। আমি আবেদন করলাম, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমার কাছে তো এই ব্যক্তিকে মোমিন মনে হয়। তিনি (সা.) মুসলমান! অর্থাৎ, এর চেয়েও অধিক আনুগত্য প্রদর্শনকারী। অতঃপর আমার বার বার সুপারিশ করার ফলে তিনি (সা.) বলেন, হে সাদ! আমি কাউকে তখন দান করি যখন তার চেয়েও কেউ আমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তাকে ফিৎনা থেকে বাঁচানো জন্য এ ভয় দিয়ে থাকি যাতে আল্লাহ্ তা'লা না আবার তাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করে।

আঁ হযরত (সা.) নিজ সাহাবীগণের মর্যাদা ও তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কেও খুব অবগত ছিলেন। তিনি (সা.) তাঁর মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত সম্পর্কে বলেন, (খলীফা হিসেবে) আল্লাহ্ তা'লা (আবু বকর ব্যতীত) অন্যদেরকে এমনিতেই রদ করে দিবেন এবং মুমিনগণও তাকে ছাড়া অন্যদেরকে অস্বীকৃতি জানাবে। এই কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত হাফসা (রা.)-এর একান্ত আবেদন সত্ত্বেও যে, ইমামতি যেন হযরত উমর (রা.) করেন, তিনি (সা.) প্রত্যুত্তরে এটাই বলেছেন, যেখানে আবু বকর, উপস্থিত আছে সেখানে অন্য কারও ইমামতি করা যৌক্তিক নয়।

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও আঁ হযরত (সা.) আপন বিচক্ষণতার অপূর্ব বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি (সা.) নিজ আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত খাওয়ানোর পর ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু আবু লাহাব তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে তিনি পুনরায় দাওয়াত দেন এবং দাওয়াত খাওয়ানোর পূর্বেই ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু হযরত আলি (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে সঙ্গ দেয় নি।

অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়া পহাড়ে অন্যান্য গোত্রগুলোকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানোর পূর্বে তিনি (সা.) এ কথাই বলেছিলেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পিছনে সৈন্যদল তোমাদের উপর হামলা করতে প্রস্তত, তোমরা কি একথায় বিশ্বাস করবে? সবাই যখন মিলিতভাবে এই কথার সত্যায়ন করে তখন তিনি (সা.) সবাইকে ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে তাদেরকে ঐশী আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেন।

প্রারম্ভিক যুগে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আরকাম (রা.)-এর ঘরই মূলত তবলীগের মূল কেন্দ্রস্থল ছিল। সেই সময় হযরত তোফায়েল বিন উমর (রা.) এবং হযরত আবু যার গাফফারী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। যখন বিরোধীতা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তিনি (সা.) একান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে নিজ সাহাবাদেরকে হাবশায় হিজরত করার পরামর্শ প্রদান করেন। দুর্বল মুসলমান ও দাস-দাসীরা যখনই কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে তখনই তিনি (সা.) সবাইকে ধৈর্য ধারণ ও দোয়া করতে বলেছেন। আর দোয়ার বদৌলতেই হযরত উমর (রা.) এবং হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

শে'বে আবু তালেবে তিন বছর বয়কটের জীবন অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অতিক্রান্ত করেছেন। তাঁর (সা.) সহমর্মীদের কাছ হতে রাতের আঁধারে শস্যদানা ও খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করতেন এবং নিরাপত্তার খাতিরে প্রতি রাতে তাঁর শোবার জায়গা পরিবর্তন করা হত।

অতঃপর আমরা দেখতে পাই, বিরোধীতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তিনি (সা.) ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু তারাও এ আহ্বান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমতাবস্থায় পুনরায় মক্কায় এসে ইসলাম প্রচারের জন্য কোন প্রভাবশালী নেতার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা জরুরী ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) মক্কার কতিপয় সর্দারের নিকট এই আহ্বান জানান যে, আমার প্রভূর বাণী প্রচারের জন্য তোমাদের আশ্রয় প্রয়োজন। অন্যান্যরা অস্বীকৃতি জানালেও মুতয়াম বিন আদি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজ ছেলে ও ভাইপোর মাধ্যমে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করায় এবং পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করায়। আবু জাহাল জিজ্ঞাসা করায় বলেন, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। আঁ হযরত (সা.) মুতয়ামের মৃত্যুর পরও তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করেছেন।

এটাও তাঁর (সা.) বিচক্ষণতা ছিল যে, তিনি (সা.) হজ্জ ও আরবের প্রসিদ্ধ মেলার সময় ইসলামের প্রচার করতেন। পরিণাম এটাই হয়েছে যে, ইয়াসরাব হতে আগত কিছু লোক এমন দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

মক্কায় যদি কারও জীবন সবচেয়ে বেশি বিপন্ন ছিল তবে তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, তিনি (সা.) তখনই হিজরত করেছেন যখন মক্কায় অসুস্থ, দুর্বল ও অসহায় মুসলমান সবাই হিজরত সম্পন্ন করে। হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.)-কে নিজ বিছানায় রেখে যাওয়া এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর দরজায় কড়া না নেড়ে বরং তাকে জানালা দিয়ে ডেকে সফর শুরু করা এমন এক পরিকল্পনা ছিল যা অত্যন্ত ফলদায়ক সাব্যস্ত হয়। আর সফরের রাস্তা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি এতটাই বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন যে, কেবলমাত্র সুরাকা ছাড়া আর কেউই তা অনুধাবন করতে পারে নি।

অতঃপর, আমরা দেখতে পাই, তিনি (সা.) হিজরতের সময় হযরত আব্বাস (রা.) (যিনি ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন)-কে মক্কায় অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন যেন মক্কায় আগত হাজীদের পানি পান করানো ও তাদের নিরাপত্তা বিধানের বরকতপূর্ণ দায়িত্ব হতে বনু হাশেম গোত্র বঞ্চিত না হয়। সেই সাথে মক্কার অবস্থা ও কুরাইশদের পরিকল্পনা সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এক অবহিত করাও তাদের দায়িত্ব ছিল। অনুরূপভাবে মক্কার দুর্বল মুসলমানদেরকে নীরবে সাহায্য-সমর্থন করাও তার জন্য আবশ্যক ছিল।

হিজরতের পর 'মুয়াখাত' (ভ্রাতৃত্ববন্ধন) প্রতিষ্ঠা করা এবং মদীনা সনদ প্রবর্তন করাও তাঁর সুমহান বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। ভ্রাতৃত্ববন্ধন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পর্ক দৃঢ় ও মজবুত হয় এবং মদীনা সনদের মাধ্যমে মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি মদীনার অন্যান্য গোত্রগুলোর মাঝে যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

মদীনায় তিনি (সা.) অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সমস্ত গোত্রগুলোর মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলনীতি জারি করেন এবং নিজ আমল দ্বারাও এগুলির বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। আমরা দেখতে পাই, তিনি যখন এক জানাযা দেখে দাঁড়িয়ে যান কেউ একথা বলেছিল, এ তো এক ইহুদীর জানাযা। তখন তিনি (সা.) এটাই বলেছিলেন, সে কি মানুষ ছিল না।

আঁ হযরত (সা.) ইহুদীদের বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করা সত্ত্বেও মদীনা সনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গেছেন এবং ইহুদীদের প্রতি ন্যায় বিচার করেছেন। তিনি (সা.) তাদেরকে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতাও প্রদান করেছেন।

আঁ হযরত (সা.) অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে মদীনা সনদের পরই মদীনার আশেপাশের গোত্রগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পারস্পারিক চুক্তি স্থাপন করেন যে, মদীনার বাইরের কোন অপশক্তি দ্বারা যদি কোন গোত্র আক্রান্ত হয় তবে পরস্পরকে সাহায্য করতে হবে। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 18 April, 2019 Issue No.16

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

তাদের এলাকায় নিরাপদে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছে। অপরদিকে কাফেরদের জন্য এ সুবিধা সহজলভ্য ছিল না।

আঁ হযরত (সা.) বিভিন্ন আরব গোত্রগুলোর সঙ্গে তাদের মানসিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন এবং তাদের প্রথা অনুযায়ী তাদের সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। এমনকি তাদেরকে পুরস্কার দিয়েছেন এবং তাদের সাথে সম্মানসূচক আচরণ করেছেন। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে তা প্রত্যাহার করেছে। যখন আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি ইয়েমেন হতে আসে তখন প্রথমেই তিনি (সা.) তাদের সর্দার আব্দুল্লাহ্ বিন অউফকে বলেন, তোমাদের মধ্যে দুটি বিষয় আল্লাহ্ ত'লা পছন্ন করেন। অতঃপর তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তির বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকেই প্রদান করেন, অথচ সেই ব্যক্তি প্রশ্নগুলো করতে ইতস্তত বোধ করছিল। তাদের এলাকায় মদের বহুল প্রচলন ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন এবং বিভিন্ন বিষয় হতে নিষেধ করেন। তারা বলে, তাদের আবহাওয়া ভিন্ন, তাই তারা যদি মদ পান না করে তবে তাদের পেট ফুলে যাবে এজন্য তাদের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ করা উচিত। একথা শুনে তিনি (সা.) হাতের ইশারায় বললেন, আমি যদি তোমাদের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করি, তবে তোমরা এর চেয়েও বেশি সুযোগ নিবে। এমনকি তিনি একথাও বলেন, এতে যদি খেজুর ভিজিয়ে খাও তবুও তোমরা একে-অপরকে তলোয়ার নিয়ে দৌড়াবে। আর কারো কারো তলোয়ার অপরকে খোড়া করে দিবে। একথা শুনে সবাই হেসে ওঠে এবং অনেকে একথাও বলে যে, সত্যিকার অর্থেই এমনটি হয়েছে আর এ কারণেই অনেকে খোড়া। অতঃপর তিনি (সা.) তাদের এলাকায় পাওয়া যায় এমন কয়েকটি খেজুরের কথা উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসার কথা উল্লেখ করেন। আর একথাও বলেন যে, তোমাদের এলাকার সব চেয়ে ভাল খেজুর হল 'বার্নি', যা রোগকে দূর করে আর এর মধ্যেও কোন রোগ নেই।

বনু তামিত গোত্রের প্রতিনিধি আসে। সে অত্যন্ত অহংকারী ছিল। কিন্তু তাদের সর্দার কায়েস বিন আলেম তার অসাধারণ সহিষ্ণুতার দরুণ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। আঁ হযরত (সা.) তাকে দেখেই চিনে ফেলেন এবং বলেন, এ হল বেদুঈনদের সর্দার।

আঁ হযরত (সা.)-এর বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় আমরা সেই সব মজলিস হতেও পাই যেখানে লোকজন তাঁকে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত। এমনি মজলিস হতে কিছু ঘটনা তুলে ধরছি।

একদা এক ব্যক্তি এই আবেদন নিয়ে আসে যে, আমার স্ত্রী এক কৃষ্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তখন তিনি (সা.) বললেন, তোমাদের কি উট আছে? সে সাথেই উত্তর দিল-হ্যাঁ, আছে। তারপর তিনি (সা.) বলেন, কি রঙের আছে? সে বলল লাল রঙের আছে। তিনি (সা.) বলেন, সেগুলোর মধ্যে গোধুম বর্ণের আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বলেন, লাল রঙের উটের মধ্যে গোধুম বর্ণ কি করে এল? সে বলল, হয়ত বা এগুলোর বাপ-দাদার মধ্যে কেউ এই রঙের ছিল। তখন তিনি (সা.) বলেন, ঠিক অনুরূপভাবে তোমার ছেলেও হয়তোবা তার পূর্ব পুরুষদের মধ্য হতে কারও রঙ পেয়েছে। এভাবেই আঁ হযরত (সা.) আজ হতে দেড় হাজার বছর পূর্বে বংশ পরম্পরায় জন্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর আলোকপাত করার মাধ্যমে এই বিষয়ের সমাধান করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) একদা হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোন আমল অধিক পছন্দীয়? তিনি (সা.) বলেন, সময় মত নামায আদায় করা। অতঃপর পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করা এবং আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। অন্যত্র তিনি (সা.) একথাও বলেছেন যে, আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল সেই কাজ যা নিয়মিত করা হয়। অর্থাৎ, তিনি (সা.) প্রতিটি শিক্ষা অবস্থাভেদে প্রদান করেছেন। যা তাঁর বিচক্ষণতারই পরিচয় বহন করে।

একবার এক সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) বলেন, যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় সেই খুশী যা এক মুসলমানকে প্রদান করা হয়।

এক ব্যক্তি জিহাদের যাওয়ার জন্য তাঁর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, হ্যাঁ, জীবিত আছে। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তাদের সেবা করার মাধ্যমে জেহাদ কর।

এক রাগী স্বভাবের ব্যক্তি তাঁর নিকট আবেদন করে যে, আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলেন, রাগ করবেন না। তার বার বার আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি (সা.) একই কথা বলেছেনন। অনুরূপভাবে হযরত আবু যার গাফফারী (রা.) যিনি একাকীত্ব প্রিয় ছিলেন, তাকে তিনি (সা.) নসীহত করতে গিয়ে বলেন, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। মন্দের প্রতিদান ভালোর মাধ্যমে প্রদান কর। আর যখন রান্না কর তখন তরকারীতে ঝোল বেশি করে দাও যেন প্রতিবেশীদেরও দিতে পার।

যখন সূরা জুমার আয়াত নাযিল হয় যেখানে 'আখারীনদের' মধ্যে একটি জামাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, যাদের মধ্যে রসূলে করীম (সা.) আবির্ভুত হয়ে তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবেন এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন। তখন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) -এর তিনবার জিজ্ঞেস করার পর তিনি (সা.) হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, ঈমান যখন সপ্তর্ষী মণ্ডলে পৌঁছে যাবে, তখন পারস্য বংশীয় এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় তা পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তরে তিনি (সা.) একথা বলে দিয়েছেন, ঈমান সপ্তর্ষী মণ্ডলে পৌঁছে যাওয়ার যুগ হচ্ছে তাঁর (সা.) পুনরাগমণের যুগ। দ্বিতীয়ত, তিনি (সা.) স্বয়ং আবির্ভুত হবেন না, বরং হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর বংশ হতে অর্থাৎ পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি আবির্ভুত হবেন যিনি রসুল করীম (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবক হবেন এবং তৃতীয়ত, সেই একনিষ্ঠ সেবক এসেই ইসলামকে পুনরায় পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। অর্থাৎ, ইসলামের হারানো শিক্ষাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করবেন।

একদা তিনি (সা.) একথাও বলেন, উম্মতে মুসলেমাহ ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামী হবে, কেবল মাত্র একটি জামাত ব্যতীত। সাহাবারা জিজ্ঞেস করেন, সেটি কোন জামাত? তিনি (সা.) বলেন, যারা আমার ও আমার সাহাবাদের পথে থাকবে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ উত্তর।

একদা তিনি (সা.) 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে আসেন। গত হয়ে যাওয়া সাহাবাদের জন্য দোয়া করেন এবং জামাতে আখারীনদের কথা স্মরণ করে অত্যন্ত আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেন: আমার হৃদয়ের আকাঙ্খা এটাই যে, আমি যদি এই চোখেই আমার ভাইদের দেখতে পেতাম! সাহাবারা বলল, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আমার সাহাবী। আর আমার ভাই হল তারা যারা এখনো আসে নি। সাহাবারা বলল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আপনার উম্মতের সেই সমস্ত লোকদের কীভাবে চিনবেন যারা এখনো পৃথিবীতে আসে নি। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা 'পানজ কুলইয়ান' ঘোড়াকে (যাদের পায়ে ও কপালে বিশেষ সাদা চিহ্ন থাকে) যদি কালো ঘোড়ার মধ্যে দেখ তাহলে কি চিনতে পারবে না? সাহাবার বলল, হ্যাঁ, চিনতে পারব। তখন তিনি (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে ওযু'র কারণে আমার সেই উম্মতের চেহারা ও পা উজ্জ্বল হবে আর আমি 'হাউযে কাওসারে' তাদের অগ্রভাগে থাকব।

এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করেন, হে রসুলুল্লাহ ! আমাদের থেকেও কি কেউ উত্তম হবে, যখন আমরা জিহাদ ও ধর্মীয় সেবার অধিক সুযোগ পেয়েছি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, এক জাতি আছে যারা তোমাদের পরে আসবে। তারা আমার উপর ঈমান আনবে, যদিও বা তারা আমাকে দেখে নি।

সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, হযরত রসুল করীম (সা.) সারা জীবন যে কাজই করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি কথা ও কাজ তিনি (সা.) স্থান-কাল -পাত্রভেদে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে ইসলাম অত্যন্ত দ্রুততার সাথে পৃথিবীর বুকে প্রসারতা লাভ করে এবং ইসলামের বিজয় পথ সুগম হয়। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী যা তাঁর বিচক্ষণতার পরিচয়ই আমাদের সামনে তুলে ধরে।

(নুরুদ্দীন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত)

(সৌজন্যে: মোরতোজা আলি, বড়িশা জামাত)

যুগ ইমামের বাণী

" আল্লাহ্ তা'লা কারো পুণ্য বিনষ্ট করেন না, বরং তুচ্ছাতিতুচ্ছ পুণ্যেরও প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৩)

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir